অন্নদাশঙ্কর রায়

ইশারা

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৬১

এক টাকা বারো আনা

প্রকাশক ঃ শ্রীগোপালদাস মজুমদার

ডি এম লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

মুদ্রাকর ঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে

নিউ মদন প্রেস

৯৫, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
পূজনীয়েষু

"ইশারা"র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ সালে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। তাঁর হাতে দেবার জন্যেই প্রবন্ধগুলি একত্র করা হয়। এগুলি বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন উপলক্ষে লিখিত। এদের মধ্যে বিশেষ কোনো যোগসূত্র নেই। এবার আরো একটি প্রবন্ধ জুড়ে দেওয়া হলো। "হিন্দু মুসলমান।" এটি সংক্ষেপিত।

ইশারা

নীতিজিজ্ঞাসা

১

নিশ্চিন্ত ছিলুম।

ছোট এক ফালি গ্রাম, ওকে ঘিরে দিগন্তজোড়া চাষের ক্ষেত। অচল অগোলাকার পৃথিবী, ওকে কেন্দ্র করে সূর্য নক্ষত্র ঘোরে। উপরে ইন্দ্রের রাজ্য স্বর্গ, নীচে যমের রাজ্য নরক। পুণ্য কর্‌লে উর্ধ্বগতি, পাপ কর্‌লে অধঃপাত।

একটি রাজা, একদল পুরোহিত, গুটিকয়েক বেনে, অনেকগুলি চাষা। এদেরি নিয়ে আমাদের দিন কাটে। এক একটি দুর্গের মতো এক একটি পরিবার, সেও এক একটি ছোটখাটো সংসার। তারই কাজকর্ম নিয়ে সে কী ব্যস্ততা! আগুন জ্বালাতে হবে, রান্না চড়াতে হবে, জল আন্‌তে হবে, কাঠ কাট্‌তে হবে—মর্‌বার ফুরসৎ নেই। পূজা পার্বণ আছে, বিয়ে পৈতে আছে, এক পরিবার নিজেকে উছলে অপরাপর পরিবারকে কুটুম্বিতায় ভাসায়, পরকে কাছে ডেকে এনে আপনারই বৃহত্তর রূপ দেখে আত্মহারা হয়।

এমনি করে হাজার কয়েক বছর কাট্‌ল। ভাবলুম, এই চিরকাল চলে আসছে, এই চিরন্তন। ভুলে গেলুম, তারও

আগে হাজার হাজার বছর নয়, লাখ লাখ বছর কেটেছে—গ্রামে নয়, বনে। পশুর সঙ্গে পশুর মতো থেকেছি, ফসল ফলাতে জানিনে, শিকার করি ; আগুন জ্বালাতে জানিনে, কাঁচা মাংস খাই। তারও আগে কোটি কোটি বছর উদ্ভিদের সঙ্গে উদ্ভিদের মতো থেকেছি—কখনো জলে কখনো স্থলে। যখন আমাদের মানুষ বলে চেন্‌বার উপায় ছিল না পশু বলে চেন্‌বার উপায় ছিল না উদ্ভিদ বলে চেন্‌বার উপায় ছিল না তখনো আমরা ছিলুম—তখন আমরা ছিলুম আগুনের কোলে।

লাখ লাখ ও কোটি কোটি বছরের তুলনায় হাজার কয়েক বছর কতই বা ! তবু অনেক। কৈশোরের এক একটা দিন শৈশবের এক একটা মাসের চেয়েও দীর্ঘ বোধ হয় না কি ? আমাদেরও বোধ হলো এই হাজার কয়েক বছরই এত দীর্ঘ যে এই সব—এর আগে বা পরে অন্য কিছু ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। যেমন আছি তেমনি থাক্‌ব। জ্ঞানের চারিদিকে প্রাচীর তুলে চেষ্টার চারিদিকে গণ্ডী কেটে মমতার চারিদিকে মধুচক্র রচনা করে দুঃখে সুখে কালাতিপাত কর্‌ব।

বটগাছের ঝুরির মতো মানুষ যখন মাটির সঙ্গে অনড় সম্বন্ধ স্থাপন কর্‌ল তখন নোঙর তোল্‌বার সময় এলো। আমরা যাযাবর—মাটি আমাদের কে ? চাষের ক্ষেত আমাদের পায়ের বেড়ী, গ্রাম আমাদের কারাগার। চোখ কান হাত পা চঞ্চল হয়ে বলল, আমরা সুদূরের পিয়াসী। মন সাড়া দিয়ে বলল বহুৎ আচ্ছা। চোখ চাইল দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ, কান চাইল

সতার ও বেতার টেলিফোন, হাত চাইল এমন সব যন্ত্র যাতে আঙুল ছোঁয়ালে আপনি চলে, মাংসপেশীকে যন্ত্রণা দেয় না। এবং পা চাইল রেল স্টীমার মোটর এরোপ্লেন। মন সকলের বাসনা মেটাল। মানুষের পক্ষে পৃথিবী তো গোষ্পদ হয়ে গেলই, পৃথিবীর অনুপাতে মানুষ বড়ো হয়ে গেল। মানুষের মনকে এখন সৌরজগতেও আঁটিছে না, মানুষের ইন্দ্রিয়গুলোর দাবীর আর লজ্জাভয় নেই। আবিষ্কারের পর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পর উদ্ভাবন ঝড়ের বেগে চলেছে, বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিবে ছুটেছে।

গত দেড়শো বছরে মানুষ যত অস্থির ভাবে বেঁচেছে গত তিন চার হাজার বছরেও তত অস্থির ভাবে বাঁচেনি। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বহুগুণ হয়ে গেছে, তার জ্ঞান বিজ্ঞান তাকে মহাশক্তিমান করেছে, তার প্রেম ইতিমধ্যে কখন পরিবারকে অতিক্রম করে নেশনকে ও নেশনকে অতিক্রম করে রেসের (race) প্রতি উন্মুখ হতে চলল। এখন তার যতকিছু আয়োজন সবই ইণ্টার-ন্যাশনাল। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে সীমান্তরেখা উঠে গেছে, একমাত্র সীমান্ত এখন পৃথিবীটা নিজে। এর বাইরে চোখকে তো পাঠাতে পারা গেছে, কানকে পাঠাবারও তো চেষ্টার ত্রুটি নেই, শরীরটাকে পাঠাতে পারলে নরনারায়ণের জয়। একে একে পঞ্চভূতকে বশে আনলে পরে মানুষের যারা আদিম শত্রু—জরা ব্যাধি মৃত্যু—তারাও কত দিন অবাধ্য থাকবে তাও গুণে বলা যায়।

২

বিংশ শতাব্দীর মানুষ কোথায় এসে উপনীত হয়েছে চেয়ে দেখি। সৌরজগতের বিরাট খেলাঘরে আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীটি একটি লাটিমের মতো ঘুর ঘুর করছে, ধূমকেতুর পুচ্ছের বাতাস লেগে যে কোনো দিন মাথা ঘুরে পড়তে পারে এবং একদিন যে সন্নিপাতের রোগীর মতো এর তাপ চলে যাবে—এও একরকম স্থির। সৌরজগতের খেলাঘরটাও অতি বৃহৎ নয় এবং সমগ্র জমিটারও জরীপ হয়ে গেছে, space নাকি অসীম নয়। মানুষের জ্ঞান এখন ডিমের ভিতরকার পক্ষিশাবকের মতো ব্রহ্মাণ্ডের ছাতে মাথা ঠুকে বলছে, ভিতরে স্থানাভাব, ছাত ফুঁড়ে বেরুতে চাই।

এদিকে ধরা পড়ে গেছে, মানুষ একটা বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয়, পশু পাখী উদ্ভিদের সঙ্গে তার পারিবারিক সাদৃশ্য আছে। উদ্ভিদে ও মানুষে যে প্রভেদ সেটা একই দেহ মনের উনিশ বিশ। মরণের পরে যদি স্বর্গ নরক থাকে তবে প্রত্যেকটি তৃণও স্বর্গ নরকে যাবে, অথচ তাদের পাপ পুণ্য নির্দেশ করে দেবার জন্যে কোনো ঋষিমুনি বা অবতার জন্মাননি, যদি তৃণরূপে জন্মে থাকেন তো আমরা অজ্ঞ। তৃণ তরু ও পশু পক্ষীর সঙ্গে আমাদের নৈতিক উনিশ বিশ কেবল এইখানে যে আমরা অনাদিকাল তাদেরি মতো থেকে মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে মহাজনদের নির্দেশ মানতে আরম্ভ করেছি ও দেড়শো দুশো বছর আগে পর্যন্ত সেই নির্দেশকে অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় মনে করে এসেছি।

তারপর দেখছি সুর্য চল্‌ছে নক্ষত্র চল্‌ছে অণু চল্‌ছে পরমাণু চল্‌ছে বিজ্ঞান চল্‌ছে অর্থনীতি চল্‌ছে পার্লামেণ্ট চল্‌ছে ব্যাঙ্ক চল্‌ছে, সকলের সঙ্গে আমরাও চল্‌ছি—পৃথিবীর কোলে বসে মহাশূন্যে এরোপ্লেনের পিঠে বসে বায়ুমণ্ডলে মোটরের কাঁধে বসে দেশ দেশান্তরে। সবাই পথিক, আমরাও পথিক। এই চলনশীল জগতে স্থির তো কেউ নয় ও কিছু নেই, স্থির কি কেবল নীতিসূত্র? জীবন থেকে স্থৈর্য চলে গেছে, প্রতিদিন আমরা এমন সব সংকটে পড়ছি যখন "চুরি করিও না" বা "গুরুজনকে মান্য করিও" আমাদের হাস্য উদ্রেক কর্‌ছে এবং "Seventh Commandment" আমাদের কাঁদাচ্ছে। একেলে জীবনে সেকেলে জীবনের ক'টা সূত্রই যে সত্যি সত্যি অনুসৃত হতে পারে এবং ক'টা সুত্রই যে নামমাত্র—প্যারিস্ শিকাগো বা বুয়েনস্ এয়ার্স্ তার সাক্ষী দিচ্ছে।

সুদ নেওয়া যদি দুর্নীতি হয় তো ব্যাঙ্ক তুলে দিতে হয়, জুয়াখেলা যদি দুর্নীতি হয় তবে স্টক্ এক্সচেঞ্জ থাকে না, মিথ্যা বলা যদি দুর্নীতি হয় তো advertisingএর কী দশা হবে, চুরি করা যদি দুর্নীতি হয় তো উঁচু ডিভিডেণ্ড আসে কোত্থেকে? যুদ্ধ করা যদি দুর্নীতি হয় তো অসংখ্য সৈনিক নাবিক বন্দুকওয়ালা বারুদওয়ালা ও তাদের কারখানার মজুর বেকার হয়। সব চেয়ে কঠিন হয় সেই সব মানুষের জীবন যারা কোনো একটা দুর্নীতির সঙ্গে পরোক্ষভাবে লিপ্ত—যেমন মিথ্যাবাদী সংবাদপত্রের কম্পোজিটর বা উঁচু ডিভিডেণ্ডওয়ালা ব্যবসাদারের কেরানী বা

বন্দুকের কারখানার মজুর বা আসামের চা বাগানের সামান্য অংশীদার। আধুনিক জগতে এমন মানুষ ক'জন থাকতে পারে যারা পরোক্ষেও পাপের সহযোগী নয়? এক মুঠো ভাতের সঙ্গে কত কৃষকের দুর্দশা কত মহাজনের দুষ্কৃতি কত দালালের দস্যুতা জড়িত রয়েছে ভাবতে বস্‌লে খাওয়া হয় না। একখানা কাপড়ের সঙ্গে কত মজুরের রক্ত কত মালিকের লোভ কত পরাজিত প্রতিযোগীর হাহাকার ওতঃপ্রোত রয়েছে ভাবতে গেলে উলঙ্গ থাকতে হয়। সব ছেড়ে যদি বাতাস খেয়েও বাঁচি তবু কত অণুবীক্ষণাতীত প্রাণীর প্রাণ নিই।

৩

এর একটা সরল মীমাংসা করেছেন কোনো কোনো হিতৈষী। নিজের ক্ষেত নিজে চষো, নিজের কাপড় নিজে বোনো, অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখলে অন্যের প্রতি অন্যায় করবার উপলক্ষ জোটে না, অন্যে যদি তোমার প্রতি অন্যায় করে তো অন্যের সঙ্গে তুমি অসহযোগ করো। প্রত্যেকে যদি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয় তো দ্বন্দ্বের কারণ থাকে না।

এরূপ মীমাংসার দুটি দোষ আছে। প্রথমতঃ এ ধরণের কথা মানুষকে বার বার শোনানো হয়েছে প্রতি শতাব্দীতে। মানুষ শুনতে চাইলেও মানুষের বিধাতা শুনতে চাননি। যে কারণে একটা cell শত সহস্র cell হয়ে মানুষের দেহ গড়ে সেই কারণে একাকার সমাজ শত সহস্র ভাগে বিভক্ত হয়ে মানুষের সভ্যতা

গড়েছে। সভ্যতাকে মানবসমাজের একটা ব্যাধি ভেবে হিতৈষীরা ভুল করেছেন। সভ্যতা অসংখ্য ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি, এর ঐক্যতানবাদনে প্রত্যেকের প্রতিভা মিলিত হয়ে সঙ্গীতের ঝঙ্কা তুলেছে। প্রত্যেক মানুষ জমি চষলে ও কাপড় বুনলে অধিকাংশের শক্তির বাজে খরচ হয় বলেই এক অবর্ণ থেকে চাতুর্বর্ণ্যের বিবর্তন হয়েছিল এবং পরে ছত্রিশ জাতেও কুলাল না। হিন্দু সমাজের মতো বৃহৎ সমাজে ছত্রিশশো জাত ছত্রিশশো পেশা অবলম্বন করল। আজ মানুষের সমাজ আরো বিচিত্র হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ কোনো একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হলে সেই মানুষটির বিশিষ্ট দান থেকে সব মানুষ বঞ্চিত হয়। আমরা ক্রমশ নির্বিশেষ থেকে বিশেষের দিকে এসেছি, এই আমাদের এভল্যুশন। এভল্যুশনকে পেছিয়ে দিয়ে বা থামিয়ে দিয়ে ফল নেই, যা একবার হতে পারে তা আবার হতে পারে যদি এই একবারটিও তাকে না হতে দেওয়া যায়। বার বার বাধা দিলেও শিশু একদিন যুবা হবেই, চকমকি পাথর একদিন দেশলাই হবেই, আবোল তাবোল একদিন সঙ্গীতে পরিণতি পাবে, হিজিবিজি একদিন চিত্রে, মুষ্টিযোগ একদিন আয়ুর্বেদে। মানুষের মাথার ভিতরে জটার সঙ্গে জটা জড়িয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মাথার উপকার জটাজুটকে ছেঁটেকেটে সে জটিলতার প্রতিকার করা যায় না। এ জটিলতাকে স্বীকার করে নিতেই হবে, স্বীকার করে নিয়ে এর মূলে রস জোগাতে হবে, বল জোগাতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ মানুষের সঙ্গ-কাঙাল, পরস্পরকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। সে বরং মার খাবে ও মার দেবে, তবু একলা থাকার পরম দুঃখ সইতে পারবে না, পাগল হয়ে যাবে। সে সকলের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে বাঁধা পড়তে চায়, কারুর সঙ্গে শত্রুর সম্বন্ধ, কারুর সঙ্গে মিত্রের সম্বন্ধ। কিন্তু কারুর প্রতি উদাসীন হতে তার স্বভাবে বাধে, কেননা কারুর ঔদাসীন্য তার স্বভাবে সয় না। আজকের দিনে যখন সব দেশের সব জাতির মিলে মিশে চলবার সুযোগ উপস্থিত হলো তখন ধাক্কাধাক্কির ভয়ে উদ্ভিদের মতো এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে প্রবৃত্তি হয় কি ? মানুষ স্বভাবতঃ সহিংসও নয় অহিংসও নয়, স্বভাবতঃ সহযোগী। পরস্পরের সহিত যোগ দিলে ঠোকাঠুকি বাধবেই, কোলাকুলি করলেও দেহে দেহে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

নরনারীর যেটি পরম মিলন সেটিকেও কি দ্বন্দ্ব বলা চলে না? আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনে দেহ চিরদিনই বাধা অথচ দেহের সঙ্গে দেহ যুক্ত না হলে আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন পূর্ণাঙ্গ হয় না। যার নাম বাধা তারই নাম সেতু। বাধাকে এড়াতে গেলে সুযোগকেও এড়ানো হয়। জাতিতে জাতিতে ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে সংঘর্ষ মানুষকে পীড়া দিচ্ছে সেটা মিলনেরই পূর্বরাগ ও অন্য নাম। আঘাত করে ও পেয়ে মানুষ মানুষকে চিনছে, নইলে যে যার পল্লী কুটিরেই পড়ে থাকতো, আজকের এই হাটের বারে খোলা মাঠে সকলের সঙ্গে কেনাবেচার ছলে

মিলিত হতো না। এত দেশের ও এত জাতির মানুষ কেমন অমোঘভাবে এক পৃথিবীর ও এক মহাজাতির মানুষ হয়ে উঠছে তা যখন ভাবি তখন কোনো ক্ষতিকেই ক্ষতি বলে মনে হয় না, যুদ্ধকে মনে হয় সন্ধিরই উপায়।

৪

বস্তুতঃ সমাজ নামক ব্যাপারটাই একটা বিশৃঙ্খলা। কত লক্ষ লক্ষ মানুষকে কত কোটি কোটি প্রাণীকে কত অগণিত পরমাণুকে নিয়ে আমাদের সমাজ। নিজের সুবিধামতো একে ছোট বড় করতে পারিনে, বেড়া দিয়ে একে ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত করতে গেলে ঝড় এসে বেড়া ভেঙে দেয়, আমাদের সাধ্য অনুসারে আমরা এক যতটুকু পরিবর্তন ঘটাতে পারি ততটুকুতে আমাদের সাধ মেটে না। তাই সন্ন্যাসীরা সবাইকে বলেছে সমাজছাড়া হতে। রুশো বলেছেন আদিম অবস্থায় ফিরতে, থোরো বনে গেছেন, অভাব সংক্ষেপ করার পরামর্শ যে কত হিতৈষী দিয়েছেন, সংখ্যা হয় না। কামনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করার উপদেশ তো তিন হাজার বছর শুনে আসছি। আশ্চর্য এই যে এখনো মানুষ বিশৃঙ্খলার নামে আঁৎকে ওঠে! এ যেন আগুনের ভিতরে থেকে আগুনের নামে আঁধার দেখা। পৃথিবীটা একটা মস্ত এরোপ্লেনের মতো আমাদের নিয়ে মহাশূন্যে উড়ছে, যে কোনো দিন চুরমার হয়ে যেতে পারে, আর আমরা উটপাখীর মতো মাথা গুঁতে ভাবছি, "Safety first!" সমগ্র

মানবজাতিটা যদি অভাব সংক্ষেপ করতে করতে নির্বাণও পেয়ে যায় তবু এত বড় জগতের অল্পই এসে যাবে, হয়তো একদিন পশুদের কেউ মানুষের মতো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে উঠবে ও এমনি বিশৃঙ্খল সমাজ নিয়ে মহাসমস্যায় পড়বে। হয়তো অপরাপর গ্রহ নক্ষত্রে এর বাড়া বিশৃঙ্খলা এর আগে দেখা দিয়েছে বা এর পরে দেখা দেবে।

সমাজ নামক ব্যাপারটা যে একটা বিশৃঙ্খলা এ আমরা অনেক আগেও জানতুম, কিন্তু এমন প্রবলভাবে জানিনি। এর কারণ এখন সমাজ বলতে আমরা গ্রাম্য সমাজটি বুঝিনে, এখনকার সমাজ সমস্ত পৃথিবীর সর্বত্র ছড়ানো। ইউরোপে যুদ্ধ বাধলে ভারতবর্ষে বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ হয়, আমেরিকায় অজন্মা হলে ইংলণ্ডে অন্নের দুর্ভিক্ষ, বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখলে হাঙ্গেরীর প্রেমিক প্রেমিকেরা প্রেমপত্রের খোরাক পায়, আমেরিকা সাকো ভানজেটিকে ফাঁসি দিলে ভারতবর্ষ আক্ষেপ জানায়। এখনকার সমাজকে প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলোর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। যেমন, অস্ট্রেলিয়ার উপকূল থেকে বাদল এলে আসামে বৃষ্টি হয়, জাপানে ভূমিকম্প হলে চীনদেশে তার রেশ পৌঁছয়, উত্তর মেরু থেকে বরফ নড়লে নিউইয়র্কে শীত পড়ে, চন্দ্র সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী এসে পড়লে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

এখনকার সমাজকে প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলোর সঙ্গে কেবলমাত্র তুলনা করলে চলবে না, তাদের অন্যতম বলেও মনে করতে হবে। পরমাণুর ঝাঁক ও পাখীর ঝাঁক, cellএর দল ও

মানুষের দল একই নিয়মের অধীন। সবাই সর্বক্ষণ সচেষ্ট, এবং কেউ কারুর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আমরা যখন বিশ্রাম করি তখনো আমাদের বিশ্রাম নেই, আমরা যখন নিদ্রা যাই তখনো আমাদের দেহে ও মনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলেছে, আমরা যখন আপনাকে নিয়ে বিব্রত থাকি তখনো আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের জীবনে তুমুল পরিবর্তন ঘটাতে থাকি এবং আমাদের অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত হলেও আমাদের প্রতিবেশীরা কোটি যোজন দূরে তারালোকেও বিদ্যমান। সমগ্র জগতের সর্বত্র একটি অনবচ্ছিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টা অক্লান্তভাবে চলেছে, তার থেকে মানুষের সমাজকে ছিন্ন করতে পারিনে। সমুদ্র থেকে ঢেউকে ছিন্ন করব কেমন করে?

কিন্তু আগেকার সমাজকে আমরা অচল পৃথিবীর মতো বাসুকীর ফণায় স্থাপন করে নিশ্চিন্ত ছিলুম, ধর্ম বলে যাকে জানতুম সেই ছিল তাকে ধরে। এখনকার সমাজ সচল পৃথিবীর মতো কোথায় চলেছে কেউ জানে না, কারুর আকর্ষণে ঘুরছে, না, আপন মনে প্রতি ক্ষণে নূতন পথ আবিষ্কার করছে, এ বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বিশৃঙ্খলা তো চিরদিন ছিল, কিন্তু তাকে যে ধারণ করেছিল ও যে ধারণ করেছে এ দু'য়ের সঙ্গতি কোথায়? সেকালের ধর্ম ও একালের বিজ্ঞানে সন্ধি হবে কেমন করে? নীতি ও প্রকৃতি এক, না, পৃথক? যা হওয়া উচিত ও যা হয়ে থাকে সমান, না, বিরুদ্ধ?

৫

যে বিশৃঙ্খলার দ্বারা পরিবৃত হয়ে আমরা এই অসমতল ও উড়ন্ত পৃথিবীতে প্রাণ হাতে করে পথ চল্‌ছি সে বিশৃঙ্খলাকে কতক পরিমাণে সহনীয় করেছে—আইন। নরকে যাবার ভয় আর নেই, কিন্তু জেলখানার ভয় আছে। তবে ধর্মভয় জিনিসটাই যখন মানুষের স্বভাব থেকে চলে যাচ্ছে তখন জেল-খানাই বা কদিন মানুষকে শাসন কর্‌তে পারবে? তা ছাড়া আইনে মানুষের ক'টা পাপ পুণ্যের দণ্ডপুরস্কার হতে পারে? গঙ্গায় ডুব দিয়ে বা যাজকের কাছে পাপ স্বীকার করে যেসব পাপের ক্ষালন হতো সে সব পাপ আইনের এলাকার বাইরে। যতক্ষণ না আইনে আট্‌কায় ততক্ষণ যে উকীলেরা পঞ্চমুখে মিথ্যা কথা বলে যায়, গণিকারা দেহ বিক্রয় করে, সৈনিকেরা স্ত্রী শিশুর উপরে এরোপ্লেন থেকে বোমা বর্ষণ করে, কারখানার মালিকরা মজুরদের নিঃসহায়তার সুযোগ নেয়—এজন্যে তাদের কোন্ নরকে যেতে হবে, কার হুকুমে? যমের আদালত কোন্‌খানে তা জিওগ্রাফিতে বা য়্যাস্ট্রোনমিতে নেই। যাঁরা আইন তৈরি করেন তাঁরা অর্থাৎ সমাজের ব্রাহ্মণরা নিজেরাই এখন অন্ধ, প্রাচীন নীতিসূত্রকারদের মতো তাঁরা নিঃসংশয়চিত্ত নন, তাঁদের দ্বারা নীয়মান সমাজ তাঁদেরি মতো দ্বিধায় দোদুল্যমান। যারা আইন মানে ও মানায় তারাই অর্থাৎ সমাজের শূদ্ররাই কেবল পেটের দায়ে চোখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্ছে ও কর্তব্য করাচ্ছে, তাদের দ্বিধা নেই সংশয় নেই। কিন্তু এই শূদ্রের অভ্যুত্থান যুগে শূদ্রও

একদিন চিন্তা করতে শিখবে, জ্ঞানের আলোকে তারও খোলা চোখ ঝলসে যাবে। তখন কী হবে?

বিবেক নামক একটা অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য গুরু আছে বটে, কিন্তু কী পরিমাণে সেটা শৈশবের গুরুজনদের হাতে ও কী পরিমাণে সেটা সমাজের দশজনের মতামত দিয়ে তৈরি কে.তা বুকে হাত রেখে বল্‌তে পারে? যাই হোক্ সেই আমাদের সম্বল এবং তার সঙ্গে আছে ইন্‌স্টিংক্ট। যখন বিবেকের পরামর্শ শুনি তখন আমরা সামাজিক মানুষ, যখন ইন্‌স্টিংক্টের তাড়না পাই তখন আমরা পশু। সামাজিক মানুষ সাবধানতাপন্থী, পশু আত্মরক্ষণশীল, বিবেকটা একটা brake বৈ তো নয়, ইন্‌স্টিংক্টটা একটা কবচ। কোথায় সেই ধর্মবিশ্বাস যা আমাদের প্রতিদিনকে inspiration দেবে, প্রতি রাত্রিকে relaxation? বিবেকের উপরে ইন্‌স্টিংক্টের উপরে আরো কিছু উদ্বৃত্ত চাই, যার জোরে আমরা পা টিপে টিপে চল্‌ব না, যার অনুপ্রেরণায় আমরা অভ্রান্ত উৎসাহে অননুতপ্ত আবেগে নিঃসংশয় সাহসে দিগ্বিদিকে অভিযান করব, যা আমাদের কাজকে গরজ থেকে মুক্তি দেবে, খেলাকে বিলাস থেকে।

বুদ্ধ খ্রীস্ট, মহম্মদ যেদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন সেদিনকার মানুষ এমন অপূর্ব আনন্দ পেয়েছিল যে সেই আনন্দের ভাগ দেবার জন্যে সাগরগিরি তুচ্ছ করে মরুভূমি লঙ্ঘন করে ঘরে ঘরে ধর্ণা দিয়েছিল, সেই আনন্দের উপর যে নীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে নীতি ইন্‌স্টিংক্ট ও বিবেকের উর্ধ্বস্তরের জিনিস।

প্রচুর কলঙ্কসত্ত্বেও তাতে অমৃত ছিল। সে ধর্মবিশ্বাস আজ আমাদের পক্ষে সেকেলে 'মোহরের মতো অব্যবহার্য। তাকে মেডাল করে বুকে ঝুলিয়ে বেড়াতে পারি, কিন্তু বাজারে ভাঙিয়ে দৈনন্দিন খোরাক কিনতে পারিনে। আমাদের ভয় যাচ্ছে, বিশ্বাস গেছে, আছে কেবল চুলচেরা বিচার করবার ক্ষমতা আর খাবার শোবার তাগিদ। বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণীর উপরে আর কিছু আমরা নই।

৬

বিশ্বাসে বল দেয়, নিষ্ঠায় বল রাখে। এই সর্বধ্বংসী অস্থির-তার দিনে কোনো কিছুর অপরিবর্তনীয়তার উপর থেকে আমাদের বিশ্বাস উঠে গেছে। নিষ্ঠা আছে কেবল জীবনযাত্রার পাথেয় সংগ্রহের প্রতি। কাল অবধি বাঁচব কি না জানিনে, জানি কাল সকালে উঠে এক পেয়ালা চায়ের দরকার হবে, সেজন্যে চারটি পয়সা যেমন করে হোক আজ গাঁটে বাঁধা চাই। "Take no thought of the morrow" সাধুদের পক্ষে সহজ, কেননা তাঁদের চায়ের ভাবনা ভাববার ভার গৃহস্থের উপরে, কিন্তু সব গৃহস্থ যদি সাধু না হয় তবে গৃহস্থের ভাবনা কে ভাববে? অগত্যা গৃহস্থ নিজেই ভাবে এবং চারটি পয়সার জন্যে প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধায়, প্রতিবেশীকে খাটিয়ে তার অর্জন আত্মসাৎ করে, প্রতিবেশীকে ছলে বলে কৌশলে চা-কর বানায়। এরি নাম Struggle for existence, এতে প্রবলের জয়, দুর্বলের

হার, নিষ্ঠুরের রক্ষা, কোমলের মৃত্যু। ডান গালে চড় খেয়েই যার মাথা ঘুরে যায় সে বাঁ গাল দেখাবে কোন্ প্রাণে?

রোজই বিজ্ঞান পুরোনো থিওরীকে উল্টে দিয়ে নতুন থিওরী খাড়া করছে, আইনস্টাইনের হাতে নিউটনের যে দশা হলো তার ফলে দেশকালনিরপেক্ষ সত্য বলে কিছু রইল না। এখন "সত্য" কথাটি উচ্চারণ করতে ভয় হয়, পাছে কেউ জেরা করে বলে, ওর অর্থ কী? ওর প্রতিষ্ঠা কোথায়? ওর এলাকা কত দূর? ওর আয়ুষ্কাল কতক্ষণ? মানুষ এখন এত বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে যে তার ক্ষুরধার বুদ্ধির সামনে যা কিছু ধরা যায় সব কাটা পড়ে। হাজার বছর হাজার লোকে যাকে সত্য বলে এসেছে আজ তা "ধর্মব্যবসায়ীর চালাকী।" যাকে মঙ্গল বলে এসেছে আজ তা "মধ্যবিত্তের আত্মসন্তোষ।" যাকে সুন্দর বলে এসেছে আজ তা "অভিজাতের শৌখীনতা।" প্রেম একটা কথার কথা, সতীত্ব একটা ন্যাকামি, দয়া একটা দুর্বলতা, ক্ষমা একটা ভণ্ডামি, বীরত্ব একটা ভড়ং, পরোপকার একটা নিগূঢ় স্বার্থপরতা, বিবাহ একটা একনিষ্ঠ বেশ্যাবৃত্তির লাইসেন্স্, মাতৃত্ব একপ্রকার সন্তানসম্ভোগ। এক কথায় "Everything everywhere is bunkum."

এই যখন আমাদের মনের অবস্থা তখন আমাদের কাছে বল প্রত্যাশা করা বৃথা। ছোট ছোট কাজে আমরা বলের পরিচয় দিয়ে থাকি বৈকি, কিন্তু সব মিলিয়ে যাকে সৃজন বলতে পারি সে ক্ষেত্রে আমাদের বল নেই, আমরা দো-মনা।

আমরা আকাশ বাতাস জয় করেছি, মানুষের মনের অলিগলির খবর রাখি, কিন্তু সব মিলিয়ে যা এক—যাকে বিশ্বাস করাটাই যাকে জানা—যাকে বোধ করাটাই যাকে বোঝা—সেই অখণ্ড ও অনির্বাণ স্বতঃসিদ্ধের বেলায় আমরা সংশয়বাদী। কেন আমাদের জন্ম, কেন আমাদের মৃত্যু, কেন আমাদের সুখ দুঃখ—কেন'র উত্তর খুঁজে পাচ্ছিনে। বেদ-বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব ও কথামালার গল্প দুই সমান আজগুবি ঠেক্ছে।

সব অস্থিরতা সত্ত্বে কী স্থির সেইটে না জানলে বিশ্বাস রাখব কার উপরে, নিষ্ঠা রাখব কার প্রতি? সব পরিবর্তন সত্ত্বে কী অপরিবর্তনীয় সেইটে না জান্লে পরিবর্তনে আনন্দ পাব কেমন করে? যা কিছু সৃষ্টি কর্ব সবই কি লোপ পাবে? যা কিছু হব তার কিছুরই কি চিহ্ন থাক্বে না? এ জীবনের কি এই জীবনেই আদি এই জীবনেই শেষ? যত খুশি অন্যায় করে গেলে কি মৃত্যুর পরে তার শাস্তি নেই? আজীবন যাতনা পেলে কি মৃত্যুর পরে তার পুরস্কার নেই? আত্মা কি অমর নয়? আমরা কি এত অসহায় যে পৃথিবীর ধ্বংস হলে আমাদেরও ধ্বংস হবে? কাল কি এত নিষ্ঠুর যে ভালো মন্দ উভয়কেই মুছে দেবে? মঙ্গলময় কি নেই?

নব্যনীতির ভিত্তিপাতের জন্যে চিরন্তনকে আবিষ্কার করা আবশ্যক।

(ইংলণ্ড, ১৯২৯)

স্ত্রীপুরুষ

১

জীবজগতের ইতিহাসে এমনো এক সময় ছিল যখন স্ত্রীও ছিল না, পুরুষও ছিল না, ছিল আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ অর্ধ-নারীশ্বর, একাধারে জননী ও জনক। ক্রমশ কেমন করে এক ভেঙে দুই হয়, দুইয়ের এক পক্ষ হয় স্ত্রী অপর পক্ষ পুরুষ, এক আধার হয় জননী অপর আধার জনক।

এক ভেঙে দুই হলো বটে, কিন্তু কী রকম দুই? যে রকম কাঁচির দুই ফলা বা মুখের দুই ঠোঁট। দুই—কিন্তু একের সঙ্গে খাপ খাবার জন্যেই অপর, একের প্রতি অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্যেই অপরের প্রতি অঙ্গ! দুই হয়েও তারা বহু নয়, তারা এক। তারা হাঁ-ওয়ালা ও না-ওয়ালা তড়িৎ, তারা সমস্তক্ষণ পরস্পরের প্রতি উন্মুখ, তাদের মধ্যে ব্যবধান নেই, তারা পরস্পরের অন্তরে বাইরে অনুপ্রবিষ্ট। তারা পাশাপাশি নয়, তারা বিপরীত; তারা বন্ধু নয়, তারা শত্রু। এক কথায় তারা দুই নয় তারা দ্বৈত, তারা যমজ নয়, তারা যুগল।

স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধটা দ্বন্দ্বেরও বটে মিলনেরও বটে। বিপরীত বলে তারা মিল্‌তে চায়, মিল্‌তে চায় বলে তার দ্বন্দ্ব বাধায়। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় তটকে নিয়ে সমাজ তটিনী প্রবহমান, পরিবর্তমান।

উভয় তটের মধ্যে নব নব সামঞ্জস্য প্রতি মুহূর্তে আবশ্যক। তাই উভয় তটের মধ্যে নবতর অসামঞ্জস্য যে কোনো মুহূর্তে অনিবার্য। স্ত্রী পুরুষের এই দাম্পত্য কলহটাকে যারা বিভীষিকা মনে করে তারা নেহাৎ বেরসিক, তারা নিতান্ত স্থূলদর্শী। আসলে এটা লীলারই অঙ্গ, সম্ভোগেরই পূর্বরাগ। স্ত্রী পুরুষ এক অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না, থাকতে পারলে তারা আর স্ত্রী পুরুষ থাকে না, তারা হয় নামহীন অর্থহীন লিঙ্গহীন ক্লীব। পূর্ব না হলে যেমন পশ্চিম হয় না, দিন না হলে যেমন রাত হয় না, হয় শূন্য, তেমনি স্ত্রী না হলে পুরুষ হয় না, পুরুষ না হলে স্ত্রী হয় না, হয় ক্লীব। শূন্য (vacuum) যেমন প্রকৃতির অসহ্য, ক্লীবও তেমনি প্রকৃতির অসহ্য। সন্ন্যাসীর উপরে তাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। তাই মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ হয়, অপাপবিদ্ধারও পদস্খলন।

স্ত্রী পুরুষ এক অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না, এই তাদের সম্বন্ধটার অন্তর্নিহিত সত্য। এই জন্যেই দ্বন্দ্ব। অনুরাগকে মধুরতর করবার জন্যেই রাগ: দাম্পত্য কলহের একমাত্র মূল্য, সেটা দাম্পত্য সন্ধিকে সুখ দেয়। সন্ধির মতো কলহটাও নিত্যকার বলে যদি কেউ সেইটিকেই স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধটার মূলগত সত্য মনে করে এবং সেইটিকেই মূলে মারবার জন্যে স্ত্রীকে পরামর্শ দেয় স্ত্রী-ত্ব ছাড়ো, পুরুষকে পরামর্শ দেয় পুরুষত্ব বিসর্জন দাও, তবে সেই হিতৈষীকে ভ্রান্ত বলতে হয়।

অথচ এরূপ হিতৈষী সেকালেও ছিলেন একালেও আছেন।

সেকালে যাঁরা পুরুষকে বল্‌তেন, কামিনী পরিহার করো, তাঁরা আসলে ঐ অসামঞ্জস্যকেই পরিহার কর্‌তে বল্‌তেন। একালে যাঁরা স্ত্রীকে বল্‌ছেন, পুরুষের সঙ্গে সমান হও ও পুরুষের মতো স্বাধীন হও, তাঁরাও আসলে ঐ অসামঞ্জস্যকেই স্বীকার কর্‌তে ভয় পাচ্ছেন ও স্ত্রীকে পুরুষের দোসর করে তুলে স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টিক্ষমতার সোপান যে বৈপরীত্য তাকেই সরিয়ে ফেল্‌ছেন। সন্ন্যাসীদের আদর্শ ছিল দৈহিক ক্লীব, Feministদের আদর্শ মানসিক ক্লীব। এই যা তফাৎ।

২

স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব ও মিলন যুগে যুগে কালে কালে কত কবিকেই না রসসৃষ্টির, কত বীরকেই না ধনুর্ভঙ্গের, কত সামান্য লোককেই না বড় বড় ত্যাগ স্বীকারের উপলক্ষ জুটিয়েছে কত স্ত্রীকেই না সতী হবার দায়িত্ব সুন্দরী হবার গৌরব কল্যাণী হবার আনন্দ দিয়ে ধন্য করেছে। যুগল আছে বলে দ্বন্দ্ব আছে বটে, কিন্তু যুগল আছে বলেই লীলা আছে। নইলে কি পাখীর কণ্ঠে গান থাক্‌ত? না, ফুলের গায়ে গন্ধ থাক্‌ত? এত রঙ্‌ ও এত রূপ আস্‌ত কোথা থেকে? এই সুন্দর বিশ্বসংসার যে অর্ধেক সুন্দর হতো না!

স্ত্রী যদি পুরুষের দোসর হতো, পুরুষ যদি স্ত্রীর যমজই হতো তবে কি তারা পরস্পরকে এমন পাগলের মতো ভালোবাস্‌ত, ধ্যান করত, স্বপ্ন দেখত? পরস্পরকে উদ্দেশ করে কাজ

করত, কীর্তি গড়ত, সুন্দর হতো, বলবান হতো? চেতন অবচেতন অচেতন ভাবে পরস্পরের সঙ্গকাতর রইত? যখন তারা দ্বন্দ্ব বাধায় তখনো তারা পরস্পরের অন্তর্লীন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ভাগী। প্রগাঢ় প্রেমের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যেই তাদের দ্বৈরথ সমর, দ্বৈরথ সমরের ছলে তারা পরস্পরের আসঙ্গ-লোলুপ। কোনো মতেই তারা দূরে থাকতে পারে না, অথচ কোনো মতেই তারা একাকার হতে পারে না। না পারে তারা ক্লীব হতে, না পারে অর্ধনারীশ্বর হতে। প্রবল অভিমানে পরস্পরকে ফেলে লক্ষ যোজন দূরে পালাতে পারলে তাদের সমস্যা ঘুচত, উন্মত্ত আলিঙ্গনে এক হয়ে যেতে পারলে তাদের লীলা সাঙ্গ হতো; কিন্তু নির্মম প্রকৃতি এর কোনোটাই হতে দেবে না, সে চায় দ্বন্দ্ব ও মিলন, কাছে আসা ও আলগা থাকা, টানাটানি ও ঠেলাঠেলি। স্ত্রীকে সে স্ত্রীই রাখবে, পুরুষকে পুরুষ এবং পরস্পরকে পরস্পরের ক্রীতদাস করে তাদের অভিমানকে চোখের জলে ভাসিয়ে দেবে।

পরস্পরের মুখে মুখ রেখে সূর্য ও সূর্যমুখী যেমন প্রহরে প্রহরে চলে, পরস্পরের প্রতি বিপরীত হয়ে স্ত্রী ও পুরুষ তেমনি যুগে যুগে চলেছে। তারা যে চির বিপরীত, এইখানে তাদের সামঞ্জস্য, তারা যে নিত্য সচল এইজন্যে তাদের অসামঞ্জস্য। চলবার সময় দু'টি পা-তে পদে পদে মতদ্বৈধ ঘটে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ থাকে তেমনি। স্ত্রী পুরুষের চলার ইতিহাসে দ্বন্দ্ব ঘটেছে প্রতিনিয়ত, তবু স্ত্রী স্ত্রীই আছে,

পুরুষ পুরুষই আছে। তা নইলে স্ত্রীও থাক্‌ত না, পুরুষও থাক্‌ত না ; থাক্‌ত কেবল সেই আদিম অর্ধনারীশ্বর, কিম্বা ক্লীবময় শূন্য।

স্ত্রী স্ত্রীই আছে, পুরুষ পুরুষই আছে, কিন্তু যে যেমনটি ছিল সে তেমনটি নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গড়ন এমন যে জল বলো আলো বলো যেখানে যা-কিছু আছে ক্রমাগত গড়াতে গড়াতে আছে, বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে আছে। দশ হাজার বছর আগে স্ত্রীর যে সব গুণ ছিল আজ সে সবের কতক আছে কতক নেই, যে কতক গেছে সে কতকের বদলে নতুন কতক এসেছে। পুরুষ সম্বন্ধেও সেই কথা। যতই যাই হোক স্ত্রী থাক্‌বে স্ত্রী, পুরুষ থাক্‌বে পুরুষ, পায়ে না হেঁটে মাথায় হাঁটলেও এর ব্যতিক্রম হবার নয়। পৃথিবী যেমন ভাবেই ঘুরুক না কেন, উত্তর মেরুর সঙ্গে দক্ষিণ মেরুর বৈপরীত্য তেমনি থাক্‌তে বাধ্য। নিজের সঙ্গে নিজের যতই তফাৎ ঘটুক না কেন একের প্রতি অপরের উন্মুখতা ততদিন থাক্‌বে যতদিন এক ও অপর থাক্‌বে।

৩

নিজের সঙ্গে নিজের তফাৎ স্ত্রীরও ঘটে পুরুষেরও ঘটে, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে বৈপরীত্যের সম্বন্ধটাকে তফাৎ সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে হয়। অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে গিয়েই দ্বন্দ্ব। সেকালের স্ত্রীর সঙ্গে একালের স্ত্রীর তফাৎ অস্বীকার করা যায় না, একালের পুরুষও সেকালের পুরুষ নয়, তবু কেন একালের স্ত্রীর সঙ্গে একালের পুরুষের দ্বন্দ্ব ? কারণ একালের স্ত্রী মুখে মুখ না রেখে

হাতে হাত রাখতে চাইছে, বিপরীত না হয়ে সমান হতে চাইছে, প্রিয় শত্রু না হয়ে প্রিয় বন্ধু হতে চাইছে। কারণ একালের পুরুষ স্ত্রীকে ঘরও দিতে পরাঙ্মুখ বাহিরও দিতে পরাঙ্মুখ, তার ঘরে ধরা দিতেও নারাজ, তাকে বাহিরে জায়গা দিতেও নারাজ। তাকে কোলেও রাখবে না, তাকে কাছেও রাখবে না। এইজন্যে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের গূঢ় সত্যটি এই যে দ্বন্দ্বেও মিলনের স্বাদ পাওয়া যায়। স্ত্রী পুরুষ মিলনব্যাকুল। আধুনিক বণিক-যুগ পুরুষকে দেশ দেশান্তরে ছোটাচ্ছে, স্ত্রীর ঘর ভেঙে দিচ্ছে, মিলনের স্বাদ দ্বন্দ্বে মেটানো ছাড়া উপায় কী? দ্বন্দ্বকে এড়াতে চাইলে যে স্বাদবোধহীন ক্লীব হতে হয়।

এমনি দ্বন্দ্ব যুগে যুগে বেধেছে। আধুনিক বণিক-যুগের আগে যে কৃষক-যুগ ছিল তার আরম্ভেও এমনি দ্বন্দ্ব বেধেছিল। যাযাবর স্ত্রীপুরুষ যখন চাষের ক্ষেতের আকর্ষণে ঘর বাঁধল, ধন সঞ্চয় করল, সন্তানকে উত্তরাধিকার দেবে বলে বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়ল, তখনও পুরাতন বৈপরীত্য এক দিনে লোপ পায়নি, নূতন বৈপরীত্য এক দিনে দেখা দেয়নি। সন্তানের খাতিরে স্ত্রীর দাবী যতই কঠিন হয়েছে স্ত্রীর কাছে পুরুষ ততই কঠিন শর্ত মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছে। স্ত্রী বলেছে, ছেলেকে এটা দিতে হবে ওটা দিতে হবে রাজত্ব দিতে হবে পৌরোহিত্য দিতে হবে। পুরুষ উত্তর দিয়েছে, তা হলে ছেলে যে আমার এইটে প্রমাণ করবার জন্যে আমার চোখে চোখে থাকো, আমার প্রতি সত্য রক্ষা করো, সতী হও। স্ত্রীর পক্ষে এসব শর্ত প্রীতিকর হয়নি, কোনো

কোনো স্থলে সে শর্ত ভেঙেছে, তাই পুরুষ পক্ষের মোড়লরা ছড়া কেটেছেন, "বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু।" কিন্তু স্ত্রী ক্রমে ক্রমে বিশ্বাসযোগ্যই হয়েছে, সতীই হয়েছে। এবং পুরুষও সন্তানকে দিয়েছে রাজত্ব বা পৌরোহিত্য বা কৃষকত্বের উত্তরাধিকার, পুরুষও শর্তরক্ষা করেছে।

কোনো কোনো স্থলে যদি পুরুষ একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে এরূপ শর্ত করে থাকে তবে এটা তার অপরাধ নয়, সে শর্ত রক্ষায় ত্রুটি করেনি। শর্ত মাত্রেই দুই তরফা, তেমন পুরুষের শর্তে যে একাধিক স্ত্রী সম্মতি দিয়েছে তারাও সেই শর্তের জন্যে দায়ী। কোনো কোনো স্থলে স্ত্রীও একাধিক পুরুষের সঙ্গে শর্তবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু একই বছরে একাধিক পুরুষের সঙ্গে থাকলে সন্তান সম্বন্ধে কারুকেই খাঁটি প্রমাণ দিতে পারা যায় না বলে একাধিক পুরুষের একেশ্বরী হওয়া স্ত্রীর পক্ষে তত সহজ হয়নি, পুরুষের পক্ষে যত সহজ হয়েছে একাধিক স্ত্রীর একেশ্বর হওয়া।

তবে মোটের উপর স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা সমান সমান বলে সাধারণত পুরুষ একাধিক স্ত্রী খুঁজে পায়নি, সাধারণত পুরুষ স্ত্রীকে কথা দিয়েছে যে সেও স্ত্রীর মতোই বিশ্বাসযোগ্য হবে। কেবল কতক স্ত্রী যারা সন্তানের জন্যে লালায়িত নয় ও কতক পুরুষ যারা সন্তানের জন্যে উত্তরাধিকার সঞ্চয় করতে অনিচ্ছুক তারা যথাক্রমে বেশ্যা ও সন্ন্যাসী হয়ে সাধারণের সমাজ ছেড়ে গেছে। বেশ্যারা গৃহস্থপত্নীদের পতিদেরকে মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু তাতে পতিদের প্রতি সতীদের

দারুণ ক্রোধ জন্মায়নি এইজন্যে যে সন্তান সম্বন্ধে পতিরা শর্তরক্ষা করেছে। দুঃখ কেবল তারা একটা না-করলেও-চলত প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর্‌তে পারেনি এই যা। এদিকে সন্ন্যাসীরা গৃহস্থ-পত্নীদের সমস্ত শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছেন, গৃহীদের তুলনায় তাঁরা দেবতা, একাধিক স্ত্রীর স্পর্শ পাওয়া তো দূরের কথা আধখানা কিংবা সিকিখানা স্ত্রীরও স্পর্শ লাগেনি তাঁদের শ্রীঅঙ্গে।

৪

এমনি করে স্ত্রী পুরুষে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল কৃষক-যুগে। স্ত্রীর উপরে পুরুষ যদি কড়া হুকুম জারি করে থাকে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে তবে পুরুষের উপরেও স্ত্রী কড়া হুকুম জারি করেছিল সন্তানের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে। তা ছাড়া পুরুষকে ব্যভিচার করিয়েছিল কে? সেও তো অপর এক স্ত্রীলোক। এক হাতে যেমন তালি বাজে না, এক পক্ষকে দিয়ে তেমনি ব্যভিচারও হয় না। Double standard of morality নিয়ে যখন তর্ক ওঠে তখন সেই অপর স্ত্রীলোকের morality টাকে স্ত্রী পক্ষের উকিলরা ধর্তব্য মনে করেন না কেন? স্ত্রী পুরুষের মাঝখানে double standard of morality বলে কিছু থাকতেই পারে না, কারণ যে ক্রিয়াটার দ্বারা স্ত্রী পুরুষের morality নির্ণীত হয় সে ক্রিয়াটাতে স্ত্রীও তেমনি লিপ্ত পুরুষও যেন। আসলে double standard of morality বলে যদি কিছু থাকে তা কুলাঙ্গনা ও বারাঙ্গনার মাঝখানে যার

সন্তান পিতৃধন ও পিতৃসম্মান পায় ও যার সন্তান সে সব পায় না তাদের মাঝখানে। অর্থাৎ তর্কটা স্ত্রীজাতির ঘরোয়া তর্ক, পুরুষজাতির সঙ্গে সেটার সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। এইরূপ একটা double standard গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর মাঝখানে আছে। আছে নয়, ছিল। কৃষক-যুগ কি আর আছে? দিন দিন অতীত হচ্ছে। পুরুষ এখন মাটির টানে বাঁধা পড়ে না, জীবিকার সন্ধানে পথে পথে বেড়ায়। পথি নারী বিবর্জিতা। বিবাহ করে তাকে গৃহে ফেলে যাওয়া যা আদপেই তাকে বিবাহ না করাও তাই। অতএব বিবাহ করতে পুরুষ বড় রাজি নয়। এদিকে বরের অপেক্ষায় বেকার বসে থাকার চেয়ে নিজের জীবিকাটা নিজে উপার্জন করা ভালো, এই মনে করে স্ত্রী আসতে চায় বাইরে। ঘরকন্নার সুযোগই যখন জুটছে না তখন বাহিরকন্না না করে সে করবেই বা কি? একবার নিজের জীবিকা সুরু করলে তাতেই সে নিজেকে দক্ষ করে তুলতে চায়, তার পরে যদি বিবাহের সুযোগ আসে তবে সে আর নতুন করে ঘরকন্নার জন্যে প্রস্তুত হতে পারে না, আগের মতোই হোটেলের শরণ নেয়, পারতপক্ষে সন্তানসংখ্যা কমায় ও সন্তানকে পাঠিয়ে দেয় বোর্ডিং স্কুলে। স্বাধীন জীবিকার স্বাদ পাবার পরে ও বিশেষ একটা বিষয়ে দক্ষতা লাভ করবার পরে বিবাহ ও মাতৃত্ব তার জীবনের ধারা বদলে দিতে পারে না, সে আমরণ ইস্কুল মাস্টারনি বা মেয়ে কেরানীই থেকে যায়। পুরুষের মতো তারও বদলি আছে, এক জায়গার কাজে ইস্তফা দিয়ে আরেক জায়গায় কাজ নেওয়া

আছে, এক দেশ ছেড়ে আরেক দেশে ভাগ্যপরীক্ষা আছে, পুরুষের মতো সেও পথে পথে বেড়ায়। পথি পুরুষো বিবর্জ্জিতঃ।

কিন্তু সত্যি কি স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে বর্জন করে একটা মুহূর্তও থাক্‌তে পারে? বিবাহ কর্‌বার উপায় নেই বলে কি সান্নিধ্য পাবারও উপায় হবে না? হতে বাধ্য। যে উদ্দাম আকর্ষণ স্ত্রী পুরুষকে ঘরে একত্র করেছিল সেই আজ তাদের বাইরে একত্র করেছে! ঘর ভেঙে বাহির গড়ে উঠছে—হোটেল মেটার্নিটি হোম, বোর্ডিং স্কুল, অফিস, খেলার মাঠ, ক্লাব, সর্বত্র পুরুষের সঙ্গ নিতে চায় স্ত্রী। তাকে নইলে পার্লামেণ্ট চলবে না, ম্যুনিসিপালিটী চলবে না, ট্রেড্ ইউনিয়ন চলবে না, খবরের কাগজ কাটবে না, সিগারেট্ কাট্‌বে না, সিনেমা খালি পড়ে থাক্‌বে। পথ বলে যাকে আমরা জানি তাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ভিড় জম্‌ছে না কি? তবে কেমন করে বলব, স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে বর্জন কর্‌তে চায়? হাঁ, বিশেষ স্ত্রী বিশেষ পুরুষকে বর্জন করেছে বটে, পতি পত্নীকে ও পত্নী পতিকে, কিন্তু স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতি পরস্পরকে বর্জন কর্‌তে পারে না বলেই পথের ভিড়ে ঠেলাঠেলির সুখ পেতে ব্যস্ত। ট্রেনে ট্রামে, অফিসে ইস্কুলে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে পর্যন্ত তারা গা ঘেঁষাঘেষির দাবী রাখে। কুলাঙ্গনা ও বারাঙ্গনা, গৃহী ও সন্ন্যাসী—এদের মাঝখানকার ফাঁক ক্রমেই বুজে আসছে। নিয়মে ও নিপাতনের ভেদ থাকছে না।

(ইংলণ্ড ১৯২৯)

সেক্‌স্‌

১

প্রথম বয়সে প্রকৃতিদেবী যে সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন তাদের স্ত্রীপুরুষভেদ ছিল না। তারা বংশবিস্তার করত আপনাকে বিভক্ত করে। দেখা গেল বংশবিস্তারের পক্ষে এই উপায় সুষ্ঠু হলেও বংশোন্নয়নের পক্ষে সুষ্ঠুতর উপায় আবশ্যক। তখন তিনি যে সকল প্রাণী সৃষ্টি করলেন তাদের এক-একজন দ্বিখণ্ডিত না হয়ে দুই-দুইজন সঙ্গত হলো। আর সেই সঙ্গম থেকে এলো তৃতীয়জন। যে দুইজনে মিলে তৃতীয়জনকে জন্ম দিল তাদের একজনের কাজ হলো গর্ভাধান, অন্যজনের গর্ভধারণ। গর্ভাধান অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই পুংপ্রাণী বোধ করল অপেক্ষাকৃত মুক্ত। সে পরীক্ষা করল, আবিষ্কার করল, উদ্যোগী হলো। তার অভিজ্ঞতা, তার পুরুষকার তার সন্তানে সঞ্চারিত হতে হতে বংশলক্ষণ গেল বদলে। বিবর্তন এক দিন মানববংশের পত্তন করল।

এক কথায় সেক্‌স্‌ হচ্ছে সেই যন্ত্র যা একজনকে করে গর্ভাধানক্ষম, অপরকে গর্ভধারণক্ষম। যন্ত্রটি সমগ্র শরীরের ভিতরে ও বাইরে এমন সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত যে, একখানা হাত কিংবা একখানা পা যেমন পরিচ্ছিন্ন সেক্‌স্‌ তেমন নয়। তার

এত দিকে এত শাখাপ্রশাখা যে, তাকে একটি বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ ভাবলে ভুল হয়। কেশ, স্তন, জঘন, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি যা কিছু একজনকে স্ত্রী বলে ও অন্যকে পুং বলে চিনিয়ে দেয় তা সেক্‌সের অন্তর্গত। সেইজন্যে ইংরাজী সেক্‌স্ শব্দের পরিভাষা খুঁজে পাইনে। আর যাই হোক "যোনি" নয়।

সেক্‌সের উদ্দেশ্য তা' হলে একাধারে বংশবিস্তার তথা বংশোন্নয়ন। কিন্তু তাই যদি সব হতো তবে প্রতি বারের মৈথুনে পুংমনুষ্যের উরস হতে ছাব্বিশ কোটি শুক্রকীট নির্গত হতো না। নারীর গর্ভধারণক্ষমতার সীমা আছে। সারা জীবনে একটি নারী খুব বেশী করে ধরলেও যমজ ইত্যাদি মিলিয়ে একশোটি সন্তানের মা হতে পারে। অথচ সারা জীবনে একটি পুরুষের উরস থেকে খুব কম করে ধরলেও ছাব্বিশ হাজার কোটি শুক্রকীট চালান যায়। আমদানি ও রপ্তানির এই যে ঘোরতর অসামঞ্জস্য, এই যে, এক দিকে একশো, অন্যদিকে ছাব্বিশ হাজার কোটি এর কি কোনো জবাবদিহি নেই ?

ছাব্বিশ কোটি শুক্রকীটের অস্তিত্ব সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত, কিন্তু সাধারণ মানুষ বেশ বোঝে যে শুক্রই পুরুষের তেজ। এর অতি সামান্য পরিমাণ ব্যয় করলে প্রকৃতির কার্যসিদ্ধি, অর্থাৎ বংশরক্ষা, হতে পারে। তবে কেন প্রকৃতি অপরিমিত স্ত্রীসম্ভোগের প্রবর্তনা দেয়, কেন দেয় দুর্বার কাম-প্রেরণা, তৃপ্তি যার নেই ? যা প্রতি রাত্রে নূতন, যা বছরে কি দু'বছরে মাত্র একটিবার সফল ?

আর্য ঋষিরা শুক্রব্যয়ের একটা রুটিন তৈরি করেছিলেন। পঁচিশ বছর বয়স না হলে ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করতেন না, পঞ্চাশ বছর বয়স হলেই গার্হস্থ্য শেষ। ভোগের সময় বলে নির্দিষ্ট পঁচিশ বছরের মধ্যে কত যে নিষেধ নিপাতন, কত যে অননুমোদিত বার ব্রত তিথি প্রহর, পাঁজিতে এখনো তার তালিকা থাকে।

কিন্তু তাতে করে প্রকৃতির কাছে জবাবদিহি পাওয়া গেল না। তাতে কতকটা আত্মরক্ষা হলো, কিন্তু জিজ্ঞাসার হলো না নিরসন। তাই প্রকৃতির উপর জাত হলো তীব্রতম অভিমান। বৌদ্ধদের "থেরী গাথা" যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন মৈথুনের প্রতি কী অপরিসীম বিরাগ, বংশরক্ষার প্রতি কী নির্মম ঔদাসীন্য! স্বামীসন্তান ত্যাগ করে কী অপার মুক্তি বোধ! "থেরী গাথা" নারীদের রচনা। পুরুষদের রচনাতে বোধ করি অধিকতর আশ্বস্তি প্রকাশিত হয়েছিল। কেননা সম্ভোগে নারীর তেমন ক্ষয় নেই পুরুষের যেমন। নারীর ক্ষয় গর্ভধারণে। তা নিয়ে অভিমান করার কিছু নেই, জিজ্ঞাসার কিছু নেই। নারী জানে যে, প্রকৃতি তাকে সেই উদ্দেশ্যে নারী করেছে। পুরুষ কিন্তু বুঝতে পারে না প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্ভোগে কেন তার মতি। বুঝতে না পারায় মতিকে মনে করে কুমতি, প্রবৃত্তিকে মনে করে পাপপ্রবৃত্তি।

বৌদ্ধদের অভিমান ক্রিশ্চানদের চিত্তে বর্তায়। তারাও গোড়ার দিকে বংশরক্ষার আবশ্যক দেখল না। তাদের ধারণা ছিল The Kindom of Heaven is at hand—স্বর্গরাজ্য

এই এলো বলে, কী হবে পুত্রপৌত্র! স্বর্গরাজ্যের যতই দেরি হতে লাগল বাবাজীরা গৃহী শিষ্যদের ততই ছাড় দিতে থাকলেন। বললেন, "বেশ। তোমরা ক্ষুদ্র জীব। কর তোমরা তোমাদের জৈব ক্রিয়া সম্পাদন। তবে ভুলে যেয়ো না, বাপধনরা, যে কাজটা পাপ। পাপেই তোমাদের উৎপত্তি। গর্ভধারণ ভালো জিনিস। কিন্তু তার মহত্ত্ব লোপ হলো যদি মৈথুনের দ্বারা তা সাধিত হলো। ইমাকুলেট্ কন্‌সেপ্‌শন্‌ই পুণ্য। কুমারসম্ভবের ইতর প্রক্রিয়া পাপ।"

এক দিকে যেমন অভিমানমূলক প্রকৃতিবিরুদ্ধতা সংসার-ত্যাগীদের দ্বারা প্রচারিত হলো অপরদিকে তেমনি আত্মরক্ষামূলক প্রকৃতিবিপর্যয় সম্ভোগবাদীদের দ্বারা আবিষ্কৃত হলো। নরনারীর সম্পর্কের নিবিড় মাধুর্য দ্বারা একবার আস্বাদন করেছে তারা চেয়েছে তাকে চিরন্তন করতে। তারা চেয়েছে অনন্ত যৌবন, অম্লান রূপ। তারা বলেছে, "নায়কনায়িকার নিত্যলীলা লোকোত্তর, মরণোত্তর। রতিবিহীন লীলাবিলাস কল্পনা করা যায় না। অথচ প্রাকৃত রতি নরনারী উভয়ের পক্ষে ক্ষয়কারক। পুরুষের অন্তর্হিত হয় তেজ। আর নারীর যদি সন্তান হয় তবে রূপলাবণ্য অবশিষ্ট থাকে না, স্ত্রীরোগে তার সম্ভোগ্যতা হানি হয়। অতএব চাই অপ্রাকৃত রতি। তার মানে মৈথুনকালে শুক্রধারণ।"

জগতের ইতিহাসে এ একটা বিপ্লব। নরম্যান হেয়ার নাকি একটি বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন যে, কণ্ট্রাসেপ্‌শন্‌ এ যুগের

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। কিন্তু এই আবিষ্কারের দ্বারা অক্ষয় যৌবনের সুরাহা হয়নি। অথচ এদেশের সহজিয়া পদ্ধতি, ওদেশের Carezza পদ্ধতি, লোহাকে সোনা করার আলকেমি। সম্ভব হোক বা না হোক, সম্ভব বলে বহু লোক বিশ্বাস করে এসেছে, আজো করে।

বিপ্লব কেন বললুম তা বিশদ করি। নারীর উপর দার্শনিক-দের বিদ্বেষ সেই সোক্রেটিসের যুগ থেকে গড়িয়ে আসছে। এঁরা পুরুষের সঙ্গে পুরুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পক্ষপাতী। তাতে নেই সন্তানচিন্তা, তা বিশুদ্ধ আনন্দ। বেশ্যার সঙ্গে যে সম্পর্ক তাতেও সন্তানচিন্তা থাকে না বটে, কিন্তু তাতে বংশরক্ষার গন্ধ থাকে, সম্ভাব্যতা থাকে। নারীর সঙ্গে বংশরক্ষাকে দার্শনিকরা এমন অবিচ্ছেদ্য জ্ঞান করেছেন যে, নারীকেই বর্জনীয় মনে করেছেন। "A married philosopher is ridiculous", নীটশের উপর আরোপিত এই উক্তির পশ্চাতে বৈরাগী মনোভাব নেই, বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি দার্শনিকের নয়। এর পশ্চাতে রয়েছে প্লেটোনিক প্রেম, যাতে প্রিয়জনকে নিকটবর্তী হতে দেয় না, দূরে দূরে রাখে। যদি না সে প্রিয়জন হয়ে থাকে সমজাতীয়, অর্থাৎ পুরুষের বেলায় পুরুষ।

এই বিপ্লবের ফলে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেলো। নারী হলো বান্ধবী, সঙ্গিনী, নায়িকা। সে যে প্রজনার্থং মহাভাগা, তার সঙ্গে যে পুরুষের সন্তানঘটিত ব্যবসায়, পুরুষের মনে এমনতর সন্দেহ রইল না। তাদের সম্পর্ক এক তৃতীয় মানদণ্ডে

পরিমিত হলো না। নরনারীর পরস্পরকে নূতন করে আবিষ্কার করল। ভারতবর্ষে রচিত হলো শ্রীমদ্‌ভাগবত, বৈষ্ণবপদাবলী। ইউরোপে ত্রুবাদুর-গীতিকা, বিভিন্ন রোমান্স-চক্র। পারস্যে স্ফী কবিতা, ওমর খৈয়াম। সুরতরসের উপর একটা দর্শন পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেল। কোথাও এই দর্শন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অশরীরী। কোথাও তেমনি স্থূল ও নির্লজ্জ। কোথাও বস্তুর মাত্রা বেশী। কোথাও ভাবের। কিন্তু সর্বত্র এই একই বাণী। নরনারীর মিলন, জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন, আপনাতে আপনি অবসিত। তার সাথে বংশরক্ষার সম্বন্ধ নেই, নেই তাতে পাপের গন্ধ। সেটা একটা means নয়, একটা end।

আধুনিক যুগে আমরা যত উপন্যাস পড়ি তাদের অধিকাংশই মিলনান্ত। নায়কনায়িকার মিলনের বাধা অপসারিত হলো, এইবার তাদের বিয়ে। অথবা নায়কনায়িকা অবশেষে প্রেমে পড়ল, এইবার তাদের সুখনীড় রচিত হবে। বংশরক্ষার ইঙ্গিত কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাতে রসভঙ্গ হয়। উপন্যাসের জগতে সন্তানসন্ততি নেই। আছে চিরন্তন নর আর চিরন্তনী নারী।

তা বলে কোনো ঔপন্যাসিক সজ্ঞানে অপ্রাকৃত রতির জয়গান করেন না। তা করা সাহিত্যে অশোভন। তবু চণ্ডীদাসের রাগাত্মিক পদাবলী মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে সে জিনিস হেঁয়ালি থাকে না। সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচানো তখন আমাদের মুখে হাসি ফোটায়। সহজ সাধনার সঙ্কেত এইখানে।

সহজিয়া গ্রন্থে সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সমাজরক্ষীদের চোখে ধুলো দিতে। ও ছাড়া উপায় ছিল না। আমাদের পাব্লিক পলিসী হচ্ছে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।" সহজিয়ারা চেয়েছিলেন পুত্রকে বাদ দিয়ে নারী। এবং সেই নারীতে ও সেই নারীর সঙ্গে অক্ষয় যৌবন। Carezzaর ইতিহাস আমার জানা নেই। অনুমান হয় ত্রুবাদুর যুগেই এর আবিষ্কার। ত্রুবাদুর যুগ সহজিয়া যুগের সমকালীন। ইতিহাসে এ যুগের মূল্য, এ যুগ শিভ্যাল্‌রির যুগ। নারীসম্ভ্রমের যুগ। প্লেটোনিক প্রেমে নারীর প্রতি সম্ভ্রম ছিল না, কেননা নারীর যেখানে নারীত্ব প্লেটোনিক প্রেম সে দিক দিয়ে যেত না। প্লেটোনিক প্রেম স্ত্রীপুরুষ-বিভেদহীন ব্যক্তিত্ব-অভিমুখ।

২

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানসিদ্ধ ভাবুকদের অভিমত এই যে ইন্দ্রিয়জ আনন্দ পাপ নয়, এর সঙ্গে বংশরক্ষার দায়িত্ব অবশ্য-সংলিপ্ত নয়, মানবের অন্তরে সম্ভোগবাসনা ও সন্তানবসনা পরিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান, যখন যেটির চরিতার্থতার ইচ্ছা হবে তখন সেটির চরিতার্থতা ঘটতে পারে। শুক্রের স্বাভাবিক নির্গম রোধ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ঙ্কর। অথচ শুক্রের নিম্নগতি নিবারণ না করলে যে সামর্থ্য ক্ষয় হবেই এমন কোনো ভয় নেই। শুক্র সম্বন্ধে সদ্ব্যবস্থা হচ্ছে সংযত ব্যয়, এর ফলে যদি সন্তান হবার আশঙ্কা থাকে তবে প্রতিষেধক কণ্ট্রাসেপ্-

শনের বহুতর প্রণালী। আর যদি যৌবন অপগত হয় তবে যৌবন ফিরে পাওয়া অপারেশন-সাধ্য। উভয়ের বিবরণ আছে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে।*

আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণ করা যেতে পারে নব কামশাস্ত্র। লেখকগণ বিশেষজ্ঞ। এঁরা নরনারীর প্রাকৃত রতিরই পক্ষপাতী। সেই রতি যাতে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় তার জন্যে এঁরা দেশবিদেশের কামশাস্ত্র তুলনা করে তাদের অভ্যন্তরে যা বিজ্ঞানসম্মত তাই সঙ্কলন করেছেন। আমাদের "কামসূত্র" ও "অনঙ্গরাগ" বাদ যায়নি। দুই পক্ষের এক পক্ষ যদি সম্ভোগের জন্যে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক না থাকে তবে কেমন করে তাকে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক করিয়ে নিতে হয় এবিষয়ে প্রাচীনরা যা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাই একরকম মানবের চরম বিজ্ঞতা। একদা আমার হাতে একখানি প্রাচীন পটের বই পড়েছিল, তাতে ছিল ৬৪ "বন্ধ" বা শৃঙ্গার-কালীন সংস্থান। লেখকেরা আমাদের শাস্ত্র থেকে কয়েকটি "বন্ধ" বাছাই করেছেন, প্রধানতঃ জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতি দৃষ্টি রেখে। প্রাচীন অঙ্গরাগ ও উদ্দীপক ঔষধাদিও আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের মূঢ়তা ও বিজ্ঞতা বিজ্ঞানের নিকষে পরীক্ষিত হয়েছে।

নব কামশাস্ত্রের এইখানেই শেষ নয়। নব কামশাস্ত্র

* An Encyclopaedia of Sexual Knowledge—by Drs. A. Willy, A. Costler and others, Edited by Norman Haire. (Francis Aldor)

অনন্তপার। তাকে এই 'বিষ্ণুশর্ম্মারা সাধারণ পাঠকের গ্রহণোপযোগী আকার দিয়েছেন। পুরুষের অঙ্গ ও নারীর অঙ্গ সম্বন্ধে শরীরবিজ্ঞানে যা থাকে তাও রয়েছে এতে। তারপর নরনারীর বিভিন্ন বয়সে অঙ্গের যে সকল পরিবর্ত্তন হয়, বয়ঃসন্ধি, নারীর মাসিক গতি, নারীর অস্তগোধূলি (menopause) ইত্যাদিও আধুনিক কামশাস্ত্রের অন্তর্গত।

বংশরক্ষার দিকটাও ভুলে যাবার নয়। ধাত্রীবিদ্যার এলাকায় যেসব তথ্যের বাস তারাও নব কামশাস্ত্রের প্রজা।

নরনারী ভোগক্ষম হবার পূর্বে তাদের মধ্যে ভোগেচ্ছা জাত হয়ে থাকে। এর পরিপূর্তি হয় আত্মমৈথুনে। ইতর প্রাণীদের মধ্যে এই অভ্যাস লক্ষিত হয়। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে এর বহুল প্রচলন ছিল। কিন্তু বহুলতর প্রচলন হয় মধ্যযুগের খ্রীস্টীয় জগতে। আধুনিক ইউরোপেও এই অভ্যাস অতি ব্যাপক। এ সম্বন্ধে সাধারণের যে ভীতি তা নরম্যান হেয়ারের মতে অলীক। "Masturbation is a normal phenomenon which appears in the vast majority of healthy children, as well as in young adults who are, for one reason or another, unable to obtain the normal satisfaction of this sexual appetite."

মৈথুন যদিও নরনারীর স্বাভাবিক লক্ষ্য তবু এই লক্ষ্যের বিকার একটি সুপরিচিত সত্য। নব কামশাস্ত্রে মৈথুনের বিকৃতি ও বিকল্প কেন ও কেমন করে ঘটে তার আলোচনা অবান্তর নয়।

এর প্রতিকার চিকিৎসাসাধ্য। এত লোক যে সিনেমা দেখতে যায় তার মূলে রয়েছে অনাবৃত বা ক্ষীণাবৃত স্ত্রী-অঙ্গ দর্শন। চুম্বন, আলিঙ্গন, এমন কি মৈথুনও, কোনো কোনো স্থলে দেখানো হয়। দর্শনেই অনেকের তৃপ্তি। আবার কেউ কেউ তৃপ্তি পায় দর্শন করিয়ে। এই সব আপদ ইউরোপের বড় বড় পার্কে ও বালিকা বিদ্যালয়ের আনাচে কানাচে বেড়ায়। Masochism ও Sadism এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ছাত্রদের প্রহার করা যে মৈথুনের বিকার তা আমাদের মাস্টার মশাইদের জানা দরকার।

নর যদিও নারীর স্বাভাবিক ভোগ্য ও নারী যদিও নরের তবু ভোগ্যের বিকারও আর একটি সুপরিচিত সত্য। নব কামশাস্ত্র একে পরিহার করতে পারে না। এও প্রতিবিধানযোগ্য। হোমেসেক্সুয়ালিটি সেই প্রাচীন গ্রীস থেকে চলে আসছে। ইতর প্রাণীদের ভিতর এর অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কত বড় বড় দার্শনিক, কবি ও চিত্রকর যে হোমোসেক্সুয়াল তার লেখাজোখা নেই। এ সম্বন্ধে এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের মত এটা জন্মগত। এর প্রতি প্রবণতা নিয়ে অনেকে ভূমিষ্ঠ হয়। অন্যান্যদের মতে এটা আকস্মিক ও এর অন্ত আছে। কতক লোক আছে তারা শিশুসম্ভোগী, কেউ কেউ শবসম্ভোগী। কারুর কারুর আবার বুড়ো বর বা বুড়ী বৌ পছন্দ। এমনও লোক আছে যাদের দুনিয়ায় কারুকে ভালো লাগে না, আপনাকে ছাড়া। এরা নার্সিসিস্ট। প্রাচীন কাল থেকে এক প্রকার

মানুষ আছে যারা মানুষের চেয়ে পশু-পাখীর পক্ষপাতী। এদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। অল্প হলে পুরাণে এত বার এদের উল্লেখ থাকত কেন?

সবচেয়ে মজার লোক হচ্ছে তারা যারা প্রাণীলোকের বাইরে থেকে ভোগ্য আহরণ করে। এদের ভোগ্যকে বলা হয় **"Fetich"**। ফেটিশ যে কত রকম তার সুমারি নেই। এক ভদ্রলোক রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দেখতেন কার জুতো সব চেয়ে ময়লা। তাকে ঘরে ডেকে এনে তার জুতো চিবোতেন, তাতে তাঁর উত্তেজনার পরাকাষ্ঠা ঘটত। আর এক ভদ্রোলোক লুকিয়ে মেয়েদের পোশাকের ক্যাটালগ থেকে ছবি কেটে কেটে রাখতেন। মাঝে মাঝে তাই বুকে চেপে ধরলেন তিনি মৈথুনের ফললাভ করতেন। ইনি একজন পাদ্রী এবং স্বামীহিসাবে বিশ্বস্ত।

৩

নব কামশাস্ত্রে বেশ্যাবৃত্তির স্থান আছে। যারা বেশ্যা হয় তাদের অনেকে যে স্বভাবদোষে হয় তার সন্দেহ নেই। তাদের স্বভাব বহুস্থলে তাদের শরীর গঠনের ত্রুটি থেকে আগত। নরমান হেয়ার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চান যে আধুনিক সমাজে পুংবেশ্যার আবির্ভাব হয়েছে। এর থেকে প্রমাণ হয় বেশ্যাবৃত্তির আদি উৎস স্বভাব দোষ বা শরীরবিন্যাস নয়, সামাজিক চাহিদা। তার মানে সমাজ চায় যে বেশ্যার দ্বারা সমাজের পুরুষদের (ইদানী পুংবেশ্যার দ্বারা সমাজের নারীদের) একটা

অভাব মোচন হোক। সে অভাবটা কিসের? এক কথায় উত্তর দেওয়া কঠিন। কেবল অবিবাহিতরা যদি বেশ্যাগমন করত তবে বলতে পারা যেত মৈথুনের সুযোগের অভাব। কিন্তু বিবাহিতরাও যায়। কেবল প্রবাসীরা যদি বাসায় খেয়ে অন্যত্র রাত কাটাত তবে বলা চলত, সঙ্গে স্ত্রী নেই, সুতরাং। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরাও যায়। বললে চুকে যায় যে যাদের স্বভাব খারাপ তারা সতী স্ত্রীকে অবহেলা করে গোল্লায় যাবেই তো, না গেলে আমরা নভেল লিখব কী নিয়ে? কিন্তু ইতিহাসে লিখছে অনেক ভালো ভালো লোকেরও এ দুর্মতি হতো। এবং হয়।

বেশ্যা শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ সাধারণের ভোগ্যা, পাব্লিক উওম্যান। সমাজ যখন প্রাইভেট প্রপার্টির ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন নারীরও দুই ভাগ হয়। এক ভাগ প্রাইভেট, বিবাহের দ্বারা তাদের দখল স্বত্ব সাব্যস্ত হয়। আর এক ভাগ পাব্লিক। তারা সমাজের এজমালি সম্পত্তি, তাতে বারোয়ারির অধিকার, তারা বারবনিতা। জমি যেমন প্রত্যেকের নিজের নিজের, আর রাস্তাগুলি সাধারণের ব্যবহার্য, কুলাঙ্গনা ও বারাঙ্গনা তেমনি। প্রাচীনকালের মহাপুরুষরা বেশ্যালয়ে আসর জমাতেন, বেশ্যার কাছে সহবৎ শিখতেন, বেশ্যার পরামর্শ নিয়ে রাজ্য চালাতেন। কোনো দেশের পুরাণে বেশ্যার সঙ্গে নরকের সংস্রব নাই, বরং আছে মন্দিরের সংস্রব, স্বর্গের সংস্রব। নরকের উপমা এলো মধ্যযুগে, সন্ন্যাসীর মস্তিষ্ক থেকে।

রূপের সঙ্গে রূপেয়ার সম্পর্ক বেশ্যার বেলা যেমন খাটে,

বধূর বেলাও তেমনি। এই গ্রন্থের লেখকরা সেই জন্যে বেশ্যাবৃত্তির সংজ্ঞা নিরূপণকালে বেশ্যার সঙ্গে টাকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করেননি। সমাজের প্রত্যেক স্তরে বিবাহও একটা বেচাকেনা, কোথাও সাক্ষাৎ ভাবে, কোথাও তলে তলে।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, মানুষ বৈচিত্র্য চায়। আর বিকারের প্রতিও অনেকের নেশা। যারা সুন্দরী স্ত্রী ফেলে বেশ্যার কাছে যায় তারা হয়তো চায় রুচির বদল, হয়তো চায় এমন সব খেয়ালের চরিতার্থতা ভদ্র মেয়ে যার জোগান দিতে পারে না। কেউ গান শুনতে, কেউ নাচ দেখতে, কেউ মাতলামি করতে, কেউ রকমারি "বন্ধ"-ধন্দের সমাধান করতে যায়। কারুর কারুর খেয়াল এমন বীভৎস যে উল্লেখ করতে লজ্জা করে। যদিও আমার এই প্রবন্ধে লজ্জাশীলতার আদর্শ রক্ষিত হয়নি।

বেশ্যার বিলোপ নেই। পরন্তু পুংবেশ্যার সূত্রপাত হয়েছে। একালের নারীরও তো খেয়াল আছে, আর আছে খেয়াল মেটাবার স্বাধীনতা। দারিদ্র্যের অস্তিত্ব যত কাল থাকবে বেশ্যা ততকাল থাকবে। কিন্তু দারিদ্র্য তো আপেক্ষিক। যার লাখ টাকা আছে সেও ক্রোড়পতির তুলনায় দরিদ্র। সাম্যবাদের দেশে বেশ্যাবৃত্তি রহিত হয়েছে দেখে আশা হয় সাম্যবাদ ব্যাপক হলে বেশ্যাবৃত্তি সংকীর্ণ হবে। কিন্তু সাম্যবাদের দেশেও খেয়ালী মানুষ অনেক থাকবে, তাদের খেয়াল একদিন চরিতার্থতার আয়োজন করে নেবেই। যদি ভাবীকালের চিকিৎসকরা এই সকল লোককে

আরোগ্য করতে পারেন; যদি শিক্ষকরা এদের খেয়ালের খতিয়ান করে সেই অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, যদি বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ প্রত্যেক ব্যক্তির রুচির ও রীতির দাবী মানে তবেই ভরসা করা যেতে পারে যে এই অবমানুষিক বৃত্তি, যা পশুদের মধ্যেও নেই, ক্রমে অপগত হবে। আপাতত বেশ্যাবৃত্তির দ্বারা সমাজের একটি উপকার হচ্ছে, sex education-এর অন্য স্কুল নেই।

সমাজের উপর বেশ্যার প্রতিশোধ যৌন ব্যাধি। এই ব্যাধিগুলি অতি প্রাচীনকাল হতে বিদ্যমান। বেশ্যাদের কাছ থেকে এগুলি আমদানি করে পতিরা সতীদের উপহার দেন, পুত্রকন্যারা সেজন্যে কৃতজ্ঞ থাকে। ইউরোপের কোনো কোনে দেশে বেশ্যাদের সরকারী ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়। কিন্তু সে পরীক্ষা নমো নমো করে দায় সারা গোছের। যৌন ব্যাধি দমন আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার অসাধ্য নয়। গবেষণার ফলে দুঃসাধ্যও নয়। কিন্তু উটপাখীর সঙ্গে মানুষের এ বিষয়ে কিছু সাদৃশ্য আছে। যা অনিষ্টকর তার সম্বন্ধে মানুষ স্বেচ্ছায় অন্ধ সাজতে চায়। "চুপ চুপ" নীতি বিশেষ করে যৌন ব্যাধির বেলায় সমাজের পরম হিতৈষীদেরকেও বোবা বানায়। সমাজ রক্ষীদের দুর্বুদ্ধিও সামান্য নয়। ব্যাধির ভয় যদি না থাকে তবে সবাই যে বেশ্যাগামী হবে! অতএব থাক ব্যাধি। হোক পতিব্রতা অসহায় পত্নীর, হোক নিরীহ নিষ্পাপ শিশুর। ঠাকুর চাকর ধোপা নাপিত ময়রা মুদী গাড়োয়ান কণ্ডাক্টার সহযাত্রী

সহভোক্তীর দ্বারা সংক্রামিত হোক সমাজের সর্বস্তরে, সমাজ-রক্ষীদেরও শরীরে। তবে হয়তো চেতনা হবে।

"চুপ চুপ" নীতির তিরোভাব না হলে মানবের ভাগ্যে সুখ নেই। প্রকৃতি যে অমৃত আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে অজ্ঞতায় অসংযমে ও সমাজিক অব্যবস্থায় তাকে আমরা গরল করে তুলেছি। তার মধ্যে এনেছি পাপ, এনেছি রোগ, এনেছি বিকৃতি। সবচেয়ে ক্ষোভের কথা, এনেছি "চুপ চুপ" নীতির জুজু। যতদিন না sex সংক্রান্ত জ্ঞান মানসাঙ্কের মতো সরল ও বর্ণপরিচয়ের মতো সুলভ হবে ততদিন অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর চাষার মতো নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে।

হিন্দু মুসলমান

আমাদের অনেকে নিখুঁৎ ইংরেজী বলেন, পোশাকও পরেন ইংরেজের মতো। আমাদের কেউ কেউ ইংরেজের মতো ফরসা। এমন কি, আমাদের মধ্যে ইংলণ্ডে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন বা আশৈশব শিক্ষা পেয়েছেন, এরূপ ব্যক্তিও বিরল নন। তবু কোনো ইংরেজ তাঁকে ইংরেজ বলে গণ্য করবে না। তিনি যদি ইংলণ্ডে বাস করেন নির্দিষ্ট কাল, তবে আইনের চোখে তিনি ইংরেজ হতে পারেন। তবু তিনি ইংরেজের দলে ইংরেজ নন। তিনি যদি ইংরেজ-কন্যা বিবাহ করেন, চার্চ অফ ইংলণ্ডের সভ্য হন, তবু তিনি যে-কে-সেই। আমাদের কথা ছেড়ে দিন, স্বয়ং বার্ণার্ড শ প্রায় ষাট বছর ইংলণ্ডে কাটিয়েও লোকচক্ষে এখনো আইরিশ। এবং লেডী য়্যাস্টর ইংলণ্ডের অভিজাত সমাজে বিবাহ করে তাদের মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য হয়ে তাদের পার্লামেণ্টের সদস্য হয়েও লোকচক্ষে এখনো মার্কিন।

তবে ইংরেজের গুণ এই যে, ওরা দু' এক পুরুষ বাদে মনে রাখে না, কে কার বংশধর। ইংলণ্ডের মাটিতে পুরুষানুক্রমে জন্মালে ও মরলে, ওদের সঙ্গে বিয়ে না করেও ইংরেজ হওয়া যায়—যেমন ইহুদীরা হয়েছে। কিন্তু এর জন্যে ইহুদীদেরকে অন্যরকম ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে। তাদের নাকি একসেট

ঘরোয়া নাম আছে। অথচ বাইরে বাইরে তারা জন স্মিথ, এডওয়ার্ড ব্রাউন, জর্জ জোন্‌স। তারা বাড়ীতে যা' খুশি বলুক, বাইরে বলে নির্ভুল ইংরেজী। তারাও মুসলমানদের মতো জবাই-না-করা মাংস খায় না, খায় না শূয়রের মাংস। কিন্তু সে তাদের বাড়ীতে। ইংরেজের দলে তারা আহারাদিতে বিল্‌কুল ইংরেজ। বিয়েটা নিজেদের মধ্যে না করলে তাদের ইহুদীত্বের ভিৎ নড়ে। রক্তের মিশ্রণ তারা হতে দেয় না। তাই তারা অন্যকে ইহুদীধর্মে দীক্ষা দিয়ে ইহুদী করে নেয় না। রক্তে আলাদা থাকার দরুণ তাদের চেহারা দেখে চেনা যায়, তারা হাজার ইংরেজ সাজলেও তারা ইহুদী।

ইহুদীদের মতো পারসীরাও রক্তের মিশ্রণ এড়াবার জন্যে পরকে তাদের ধর্মে দীক্ষা দেয় না, পারসী করে নেয় না। নিজেরা কিন্তু পোশাকে ভাষায় আচারে ব্যবহারে পরের নকল করতে করতে অন্যরকম হয়ে গেছে। মাণিকজী দাদাভাই—এর কোন কথাটি ফার্সী? আজকাল ইংরেজের অনুকরণে পার্থিব সুবিধা। যে-কারণে দত্ত হয়েছেন ডাট, মিত্র হয়েছেন মিটার, সেই একই কারণে পারসীরা আর এক পা এগিয়ে গিয়ে কুপার, মরিস, কণ্ট্রাকটর, ক্যাপটেন, ইত্যাদি ইংরেজী নামকরণ করেছেন। দুঃখের বিষয়. এর সবগুলি ইংরেজী শব্দ হলেও ইংরেজী নাম নয়।

ওদিকে নিগ্রোরাও নিজেদের ইংরেজী নামকরণে ওস্তাদী দেখাচ্ছে আরো বেশী। আমার কাছে 'লণ্ডন টাইম্‌সে'র সেই-

সংখ্যাটি নেই, যাতে এর অনেকগুলি নমুনা ছিল। আমরা তো নিচ্ছি শুধু বিশেষ্য পদ। ওরা নিচ্ছে ক্রিয়া-বিশেষণ। একটা-কিছু হলেই হলো। যেমন, "জেমস ভেরি গুড প্লিজ অলরাইট ম্যান।"

এবার ইংরেজের কথায় ফিরে আসা যাক।

বহু ফরাসী ওলন্দাজ জার্মান রাশিয়ান রক্তের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ইংরেজ হয়ে গেছে। রক্তের মিশ্রণকে ইংরেজসমাজ ক্ষতিকারক মনে করেনি। ইংরেজ ধর্মবিশ্বাসের ঐক্য দাবী করে না। অনেক ইংরেজ চার্চের এলাকার বাইরে। কেউ মুসলমান হলে তাঁর জাত যায় না। ইংরেজ ও অন্ইংরেজে প্রভেদ ধর্মগত নয়, রক্তগত। ইংলণ্ডবাসী ইহুদীদের ধরলে, রক্তগতও নয়, ঐতিহ্যগত। ইংলণ্ডের স্বকীয় ট্র্যাডিশনকে আপনার করলে, আপনাকে সেই ট্র্যাডিশনের বাহক করলে, ইংরেজের মতো ভাবলে, ইংলণ্ডের স্বার্থকে প্রথম স্থান দিলে ইহুদী বা পারসী থেকেও ইংরেজ হওয়া যায়।

এর সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করা যাক।

এ-দেশেরও একটা ঐতিহ্য আছে। অতিদীর্ঘ এর ইতিহাস। ঐ ইতিহাসের আদি থেকে কে কে এ-দেশে আছে, কে কে পরে এসেছে, তা হিন্দু সমাজের রূপ দেখে বোঝবার উপায় নেই। এমন মিশাল ঘটেছে যে, যারা পরে এসেছে, তারাও নিজকে আদি-ভারতীয়দের বংশধর বলে বিশ্বাস করে। রাজপুতরা ভাবে, তারা মহাভারতীয় যুগের ক্ষত্রিয়। মহাভারতীয় যুগের ক্ষত্রিয়

রক্ত যে একেবারে তাদের দেহে নেই, তা কে জোর করে বলবে! তবু ক্ষত্রিয় না হয়ে রাজপুত হলো তাদের নাম। আমরা হিন্দুরা ভারতবর্ষের সমগ্র ঐতিহ্যকে দাবী করে থাকি। আমাদের এ-দাবী অন্যায় নয়। কারণ আমরা যাদের বংশধর, তাদের কেউ-না কেউ আদিতে এদেশে ছিল। তাদের রক্তধারার, তাদের ভাবধারার বাহক আমরা। তারা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

যারা আদিকাল থেকে জাতীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছেন, তেমন জাতি পৃথিবীতে বেশী নেই। আমাদের হিন্দুদের প্রধান গর্ব এই যে, আমরা তেমনি একটি জাতি। আমাদের কৌলিন্য অবশ্য ঝুটা। রক্তের বিশুদ্ধি কাল্পনিক! একদিন আমাদের ভ্রান্তি ছিল যে আমরা অমুক অমুক ঋষির গোত্র। আজো বিয়ের সময় সেটা মনে পড়ে যায়। চোখের সামনে কোচেরা রাজবংশী ও রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় হয়ে উঠল। এখন তারাও চন্দ্র সূর্যের নীচে কথা কইবে না।

তা হোক, একই দেশে একাধিক ঐতিহ্য সম্ভব নয়। একদিন না একদিন সবাইকে মূল স্রোতে ভাসতে হবে। মূলস্রোতটা রাজবংশীদের ধারণায় রক্তকৌলিন্য। যেমন আমাদের শিক্ষিতদের ধারণায় ছিল এবং দরকারের সময় ফিরে আসে। কিন্তু তা যে নয়, এ বিষয়ে শিক্ষিতদের দ্বিমত নেই। তবে কারুর কারুর নতুন ধারণা, হিন্দুর হিন্দুত্ব তার ধর্মবিশ্বাসে। এই বলে এঁরা হিন্দুধর্মের একটা সংজ্ঞা তৈরি করছেন। সেই সংজ্ঞা যদি

কোনো জাপানী বা আমেরিকান গ্রহণ করে, তবে সেও নাকি হবে হিন্দু! তার মানে হিন্দুত্ব ভারতবর্ষের বাইরে টিকতে পারে। এঁরা ভুলে যান যে বিদেশীয় 'হিন্দুরা' বা 'আর্য-সমাজীরা' তাদের জাতীয় প্রকৃতি বদলাতে পারে না। এবং জাতীয় প্রকৃতি যদি বেঁচে থাকে, তবে একদিন ধর্মের ভেক বদলানো কাপড় ছাড়ার মতই সোজা। জাভার দৃষ্টান্ত কী শিক্ষা দেয়?

দেশের মূলস্রোত ঐতিহ্য। প্রত্যেক দেশের স্বকীয় ঐতিহ্য আছে। কোনো কোনো দেশ তা রাখতে পেরেছে। কোনো কোনো দেশ তা রাখতে পারেনি। কোনো দেশে একটানা স্রোত; কোনো দেশের স্রোত মাঝখানে শুকিয়ে গেছে। অতীত ও বর্তমান স্রোতের মাঝখানে বিস্মৃতির বালুচর। অতীত বন্ধ্যা, বর্তমান তার দত্তক পুত্র। এসব দেশের একখানার স্থলে দু'খানা ইতিহাস লিখতে হয়। ফারাওদের মিসর, আরবদের মিসর। মায়া ও আজটেক আমেরিকা, ইউরোপীয় আমেরিকা।

ভারতের ঐতিহ্যের সংজ্ঞা দিতে যাওয়া বৃথা। কোনো জীবন্ত জাতি নিজেদের সংজ্ঞা দেয় না। মরণের সংজ্ঞা আছে, জীবনের নেই। আমরা বহমান, আমরা বিদ্যমান। আমরা দিন দিন কাপড় ছাড়ছি। নখ কাটছি। চুল ছাঁটছি। আমরা পরিবর্তিত হচ্ছি, বিবর্তিত হচ্ছি। আমাদের ধর্মবিশ্বাসও তলে তলে বদলে যাচ্ছে। আমাদের ধর্মগ্রন্থ চূড়ান্ত নয়, তারও পরিবর্তন ও বিবর্তন আছে। পৌর্বাপর্য রক্ষা করে

হিন্দুসমাজ বার বার সংস্কৃত হয়েছে। প্রত্যেক জীবন্ত সমাজের রীতি এই। ইংরেজও চিরকাল বাঁধা ধর্ম মানেনি, বাঁধা আচার মানেনি। ইংরেজ রক্তও কত রক্তের সাঙ্কর্য। ইংরেজী ভাষাও কত ভাষার সাঙ্কর্য। আধুনিক ইংরেজের মধ্যে আদিম ব্রিটনও রয়েছে।

ভারতবর্ষে যেমন মুসলমান আছেন তেমনি খ্রীস্টানও আছেন। সংখ্যা কার বেশী কার কম সেটা আকস্মিক, সত্যই আসল। সংখ্যার বাড়তি কমতি আছে, একটা বন্যায় বা ভূমিকম্পে মেজরিটি মাইনরিটি হতে পারে। সংখ্যার উপর সত্যের স্থান। খ্রীস্টানের সংখ্যা কম বলে তাঁর অস্তিত্ব কম নয়।

খ্রীস্টান আছেন মালাবার অঞ্চলে প্রায় প্রথম শতাব্দী থেকে। তার মানে ইস্লাম যদি এদেশে আট শ'বছর আগে প্রচারিত হয়ে থাকে খ্রীস্টবিশ্বাস প্রচারিত হয়েছে আঠার শ' বছর আগে। খ্রীস্টানদের সঙ্গে এদেশের সম্পর্ক দ্বিগুণকালব্যাপী। তবে পর্তুগীজ আগমনের পূর্বে খ্রীস্টবিশ্বাসে দীক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না, মিশনারীতে দেশ ছেয়ে যায়নি।

খ্রীস্টানরা যেমন প্রথম শতাব্দীতে মালাবারে আসেন সীরিয়া থেকে, তেমনি আরবরাও এসেছিলেন ও আসতে ছিলেন ভারতের সমুদ্রতটবর্তী যাবতীয় প্রদেশে। আর্যযুগের পূর্বে যখন দ্রাবিড় যুগ ছিল তখন সামুদ্রিক বাণিজ্যও ছিল। সমুদ্রযাত্রায় আরবরা

চিরকাল অভ্যস্ত। আরবদের হাত দিয়েই ভারতের পণ্য ইউরোপে যেত।

তারপর কেবল যে আরবদের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাই নয়, পারসিকরাও কখনো যুদ্ধ করতে, কখনো সৌর উপাসনা প্রচার করতে এদেশে এসেছিলেন খ্রীস্টজন্মের বহু পূর্বে। গ্রীক, গ্রীকবংশী, শক ও হূনদের কথা সবাই জানেন। আমি শুধু জোর দিতে চাই আরব পারসিকদের উপর। এঁরা ভারতবর্ষে বসবাসও করেছিলেন, করে অবিকল ভারতবর্ষীয় হয়ে গেছেন। আমরা হিন্দুরা এঁদেরও বংশধর।

আরবরা নিরীহ বণিক জাতি ছিলেন, ইসলাম তাঁদের দিগ্বিজয়ী করে। ইসলাম নিয়ে তাঁরা ভারতে এলেন, কিন্তু সিন্ধু প্রদেশের এদিকে অগ্রসর হতে পারলেন না। তাঁদের অসমাপ্ত কাজ আফগানদের উপর পড়ল। আফগান ও তুর্কিস্থানীরাই ভারতে রাজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং পরাজিত হয়ে মুঘলকে পথ ছেড়ে দেন। পারসিকদের এতে একেবারেই হাত ছিল না।

অথচ ভারতের আফগান, তুর্কিস্থানী, মুঘলরা পারস্যের ভাষাকে রাজভাষা ও আরবের ভাষাকে ধর্মভাষা করলেন। সেই দুই সূত্রে আরব পারস্যের সংস্কৃতি মুসলিম সংস্কৃতিরূপে ভারতে উপনীত হলো। আরব ও পারসিক কেউ কেউ ভাগ্যপরীক্ষা করতে এসে রাজসরকারে কাজ পেলেন, জায়গীর পেয়ে এদেশে বাস করলেন। এঁদের স্বকীয়তা এঁদের মুসলমানত্বের দ্বারা

আচ্ছাদিত হলো। অন্যান্য দেশে যেমন সারাসেন সভ্যতার সৃষ্টি হয় তেমনি এদেশে হলো এক বিমিশ্র সভ্যতা, তাতে রাজপুতদেরও অংশ ছিল। তা ভারতের প্রচলিত ভাষাকে গ্রহণ করে তার ক্রিয়াপদ অক্ষুণ্ণ রেখে তাতে বিদেশী বিশেষ্য বিশেষণ মিশিয়ে তার নাম দিল উর্দু ওরফে হিন্দুস্থানী। শিল্পে ঘটেছে সারাসেনের সহিত রাজপুতের মিশাল, অনেক স্থলে রাজপুতের উপর সারাসেনের প্রলেপ। মন্দিরের কারুকার্য নিয়ে মসজিদের অঙ্গে গ্রথিত করলে পাঠান রাজাদের কার্যসংক্ষেপ হতো। মুঘলরা কার্যসংক্ষেপ করেননি, কিন্তু তাঁদের কার্যে ডাক দিয়েছেন রাজপুতদের, শিল্পীদের মধ্যে ভেদ-বিচার করেননি।

ছয় সাত শ' বছরের মুসলমান রাজত্বে বিদেশী রক্ত যা এসেছে তাকে তার আগের দুই তিন হাজার বছর ধরে আসা বিদেশী রক্তের চেয়ে বেশী বলবার কারণ নেই। সংস্কৃতি যা এসেছে তার সম্বন্ধেও সেই কথা। কত আরব পারসিক গ্রীক গ্রীকবংশী শক কুশান হূন তিব্বতী চীনা মগ আর্য দ্রাবিড় আদিম রইল একদিকে। অন্য দিকে দাঁড়াল আফগান তুর্কিস্থানী আরব পারসিক ও তাদের দ্বারা ইসলামে দীক্ষিত পূর্বোক্তবংশীয়। দুই পক্ষের নাম হয়েছে হিন্দু মুসলমান।

হিন্দু-মুসলমান একই দেশের মাটির উপর বাড়ী করেছে, এটা আকস্মিক। এই আকস্মিকের উপর মিলনের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। মিলন হয় যদি দেশের সনাতন ধারার সঙ্গে এরা আপন আপন সত্তা মিলিয়ে দেয়। প্রত্যেক দেশের একটি

সনাতন ধারা আছে। ভারতবর্ষে যখন আর্য আসেনি তখনো এ ধারা ছিল। আমেরিকায় যখন শেতাঙ্গ যায়নি তখনো এ ধারা ছিল। জয়গর্বে আত্মাভিমানে প্রায় প্রত্যেক দেশেই আগন্তুকরা আদিমদের অগ্রাহ্য করেন, সনাতন ধারাকে করেন অস্বীকার। মহাকাল নেন এর প্রতিশোধ। একদিন না একদিন আগন্তুকের ঘাড় ধরে একই ঘাটে জল খাওয়ান। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গরা নেটিভদের দ্বারা অতি অলক্ষ্যে প্রভাবিত হচ্ছে। নেটিভরা কেবল মানুষ নয় ওরা দেশ। দেশের জল বাতাস বন আকাশ ওদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে। ওরা বিজিত হতে পারে, কিন্তু ওদের দেশ একদিন জয়ী হয় আগন্তুকের উপর। কাইজারলিং তাঁর "ইউরোপ" নামক গ্রন্থে এর আলোচনা করেছেন। দেশের অতীতকে মেনে নিতেই হবে, নিস্তার নেই। ধর্মবিশ্বাস তার সঙ্গে লড়াই করে পারে না, সামঞ্জস্য করতে বাধ্য হয়। আর্য বলে আমরা বড়াই করতে পারি, কিন্তু বৈদিক ধর্মবিশ্বাসের বিশুদ্ধি আর আছে কি? সে সমাজব্যবস্থাই বা কোথায়? দ্রাবিড় জয়লাভ করেছে, আদিম তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আগন্তুক আর্যদের নাম নয়, আদিমদের জননীর নাম আজ আমরা ধারণ করেছি। আমরা হিন্দের সন্তান। আমরা হিন্দু। যে সব আর্য ভারতের বাইরে থেকে গেছেন—যেমন জার্মান বা ইংরেজ—তাঁদের প্রতি আমাদের মমতা নেই। আমাদের ভারতীয়ত্ব আমাদের প্রকৃত রূপ। আমাদের আর্যামি একটা পৈতামহিক পরিচ্ছদ।

মুসলমানকে ভারতের প্রয়োজন আছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে মানুষ হিন্দু থাকতে "দাস্য সুখে হাস্যমুখ বিনীত যোড় কর" ছিল সেই মানুষ মুসলমান হয়ে "উন্নত মম শির" বলে গান গেয়ে উঠেছে। সে তার আত্মার গান। যথার্থই তার কাছে "নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।" হিন্দুসমাজে যে কয়জন ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁরাই কেবল ওকথা বলতে পারেন। জনসাধারণকে ও মন্ত্র উচ্চারণ করতে হিন্দুসমাজ অন্তরে অন্তরে আপত্তি করে এসেছে। তাই আজ ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সকলেরই প্রণাম করতে করতে মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে।

ধার্মিকের চিরকৌমার্যের প্রতি হিন্দুসমাজের একটা অস্বাস্থ্যকর পক্ষপাত আছে এবং বিধবার পক্ষে এই হলো বিধি। এগুলি হয়তো আমাদের তিব্বতী ও দ্রাবিড় পূর্বপুরুষের কাছে পাওয়া সংস্কার। এমনি একটি সংস্কার আমাদের গোভক্তি। যারা ছাগরক্তে কালীঘাট ধৌত করেছে, বলিদানে মহিষাসুর বধ করতে যারা দ্বিধা বোধ করে না, গোমাতাকে প্রহার করা যাদের নিত্য কাজ তারাই মুসলমানের প্রতি ঘৃণায় কণ্টকিত, ওরা যে গোরু খায়! এসব সংস্কার যে কত বিসদৃশ ইসলাম গ্রহণ করলে এক মুহূর্তে বোঝা যায়।

আর্যদের আগমনের পূর্বে আদিম ছাড়া অন্য যে কয়টি জাতি ছিল তারা যে কে কখন ও কোনখান থেকে এসেছিল তা স্থির

করা কঠিন। এই পর্যন্ত স্থির যে তারা স্বতন্ত্রভাবে নানাদিক দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল এবং আদিমদেরকে রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো খেদিয়ে দিয়ে নিজেরা মালিক হয়ে বসেছিল। তারা গোড়া থেকে সভ্য ছিল, কি ক্রমে ক্রমে সভ্য হলো, তাও বলা কঠিন। কিন্তু তারা যে আর্য আগন্তুকদের চেয়ে সভ্য ছিল এর ভুল নেই। আমরাই ভুল করে থাকি আর্যদেরকে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলদের চেয়ে সভ্য মনে করে। এটা আমাদের আগন্তুক মানসিকতা।

মুসলমানরা এদেশে আসার আগে হিন্দুরা কম সভ্য ছিল না; তবু আমাদের মুসলমানদের ধারণা তাঁদের খানা ও পোশাক বেশী জাঁকালো বলে তাঁরাই সভ্যতর। তেমনি আমাদের আর্যামির মোহ। আসলে কিন্তু আর্যেরা ছিলেন মোটের উপর আদিমদের মতো একবৃত্তিসম্পন্ন। গোড়ায় মৃগয়ার অতিরিক্ত বিশেষ কিছু তাঁদের করণীয় ছিল না। তবে তাঁদের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ হয়েছিল, তাঁরা আসবার সময় বেদের কতক অংশ রচনা করে সঙ্গে এনেছিলেন। কেমন করে তাঁরা এদেশে এলেন এ সম্বন্ধে আমার অনুমান এই যে, তাঁরা এলেন ঠিক তেমনি করে যেমন করে পরে এলেন পাঠান ও পাঠানের পরে মোগল। অর্থাৎ ভারতের গৃহশক্রর আমন্ত্রণে। কোনো এক জয়চাঁদ কি লোদি-বংশাবতংস তাঁদের ডাকলেন মিত্ররূপে। তাঁরা মিত্র হয়ে এলেন, রাজা হয়ে থাকলেন। আর্যদের আগমন একবারে ঘটেনি। একই পথেও তাঁদের সকলে আসেননি।

আর এক জাতিও তাঁরা ছিলেন না। তাঁদের নানা শাখা, নানা উপজাতি ছিল। আর্যদের আগমন বহু শতাব্দী কাল ব্যাপী।

তাঁরা এসে দেখলেন যে স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁদের বিবেচনায় বর্বর। আপনাকে বড় ও অপরকে ছোট মনে করে মানবমাত্রেই, বিশেষ করে বিজেতা মানব। এই অহঙ্কারটুকু অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁরা যা দেখলেন তাই আত্মসাৎ করতে লাগলেন। আর্যপূর্ব ভারতীয়দের সমাজদেহ বহুবৃত্তিসম্পন্ন জটিল ছিল। তাদের কেউ করে চাষ, কেউ করে ভোগোপকরণ নির্মাণ, কেউ করে আমদানি রপ্তানি, কেউ কেবল যুদ্ধই করে। ইংরেজরা যেমন মুঘলদের শাসনযন্ত্র হাতে নিয়ে তারই চাকাটা স্প্রিংটা কব্জাটা ইস্ক্রুপটা যখন যেটা দরকার তখন সেটা পাল্‌টিয়ে ও যোগ করে তাকে আজ পৌনে দু'শ' বছর পরে ভিন্ন আকার দিয়েছেন, তেমনি আর্যরাও দ্রাবিড় ইত্যাদির চলন্ত ঘড়িতে দম দিতে দিতে মেরামত করতে করতে উন্নত করতে করতে তাকে আজ হিন্দুসমাজ নামক বিচিত্র জটিল দুর্বোধ্য একটি ঘড়িতে পরিণত করেছেন।

জাতিবিভাগ ভারতের বৈশিষ্ট্য। এর তাৎপর্য এই যে সমাজের এক অঙ্গের কাজ অপর অঙ্গ করবে না, সেই অঙ্গই করতে থাকবে। এই উপায়ে প্রতিযোগিতা ও তার আনুষঙ্গিক অনিশ্চয়তা নিবারিত হবে। ইউরোপের সমাজে সকলের সব ব্যবসায়ে অধিকার আছে। ভারতে ডোমের অধিকার নেই ময়লা সাফ করবার। হাড়ির অধিকার নেই মড়া ছোঁবার। একের

কাজ করতে অপর অসম্মত। তাতে উভয়ের অন্ন থাকে। এক পক্ষের অন্ন যায় না।

একান্নবর্তী পরিবার ভারতের বৈশিষ্ট্য না হলেও ভারতে বদ্ধমূল। বৃহৎ পরিবারের প্রত্যেক সভ্য প্রয়োজনমতো খাদ্য-পরিধেয় পায়, সাধ্যমতো উপার্জন করে পারিবারিক ভাণ্ডারে দেয়। বেকার, বৃদ্ধ, বিধবা, বিকলাঙ্গ এদের ভরণপোষণের জন্যে সমাজকে চাঁদা দিতে বা রাষ্ট্রকে সদাব্রত খুলতে হয় না। পরিবারের উপরই এর ভার।

আমার মনে হয় আর্যদের পূর্বেই জাতিবিভাগ ও একান্নবর্তী প্রথার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অবশ্য এমন বিপুল আয়তনে নয়। সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রথা দিনে দিনে, বছরে বছরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী, সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ ধরে বিরাট বটবৃক্ষের ব্যাপকতা পায়। কোনো একদিন একদল বুদ্ধিমান মিলে রাতারাতি সমাজ গঠন করেন না। সমাজ গঠিত হয় বহুদিনের প্রয়োজনে, পরীক্ষায়, ভুলভ্রান্তির অভিজ্ঞতায়।

বাংলায় দেখা যাচ্ছে চাষ প্রধানতঃ মুসলমানের হাতে। চাষী মুসলমান একটা জাত না হলেও জাতের যাবতীয় লক্ষণ তাদের ভিতর আছে। তারা ক্বচিৎ অন্য প্রকার মুসলমানের সঙ্গে বিবাহাদি করে কিংবা খায়। একান্নবর্তী পরিবারও তাদের তেমনি হিন্দুদের যেমন। সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার থাকায় বহু বিবাহের প্রলোভন অনেকে এড়াতে পারে না। স্ত্রীর সম্পত্তির লোভে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। তাতে জনসংখ্যা এত বেশী

বাড়ে যে সম্পত্তির ভাগ হলে দেখা যায় সম্পত্তির চেয়ে শরিক বেশী। বিধবার ভাগে সম্পত্তি পড়ায় বিধবাকে বিবাহ করতে অনেকের আগ্রহ। মুসলমান সমাজে বিধবার পুনর্বিবাহ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ চাষী মুসলমানদের বেলায়।

আশ্চর্য এই যে চাষকে বাংলার ইস্‌লাম সম্মানকর মনে করে, অথচ তাঁতকে করে ঘৃণা। কসাইয়ের কাজ গর্হিত নয়, কিন্তু ধীবরের কাজ অবজ্ঞাত। তাঁতী ও জেলে মুসলমানদের মধ্যে অনেক। কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে এরা সেন্‌সাসে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় দিতে নারাজ। এদের সঙ্গে চাষী মুসলমান কুটুম্বিতা করে না, এরা এক হিসাবে অন্ত্যজ। ঢাক বাজায়, গান করে, সাপ খেলায় এমন মুসলমান আছে বিস্তর। কিন্তু ইসলামে এসব কাজ নিষিদ্ধ। সুতরাং এদের সঙ্গে বিবাহাদি করাও সৎ মুসলমানের পক্ষে নিন্দনীয়।

বিজেতাকে বয়কট করার নীতি আজকের নয়। হিন্দু সমাজ আটশ' বছর আগে সংকল্প করে, মুসলমানের সঙ্গে সংস্রব রাখবে না। এই বয়কটের ভাব এখনো লোপ পায়নি। মুসলমানের জল খাব না, তাকে স্পর্শ করলে স্নান করব ইত্যাদি পুরুষানুক্রমে গড়িয়ে আসছে। এই নীতির ভুক্তভোগী মুসলমান আমাকে দুঃখের সহিত জানিয়েছেন যে এতকাল একত্র থেকেও তাঁরা হিন্দুর কাছে পল্লীঅঞ্চলে উদার ব্যবহার পাননি, এমনকি যেক্ষেত্রে হিন্দুরা তাঁদের প্রতিবেশী ও বন্ধুসদৃশ। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে তাঁরা হয় বিজেতারূপে এসেছেন, নয় বিজেতার দলে যোগ দিয়ে পর হয়ে

গেছেন। হৃদয় জয় করবার দায়িত্ব তাঁদেরই। যারা হারে তারা কখনো ভোলে না, ক্ষমাও করে না তারা মহত্ত্বের পরিচয় না পেলে। মুসলমান সমাজের মধ্যে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করে হিন্দুদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। মুসলমান পীর হিন্দুরও গুরু। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে মুসলমান—মুসলমান সমাজ—হিন্দুসমাজের প্রতি কি ব্যবহার করেছেন? হৃদয়জয়ের কোনো চেষ্টা হয়েছে কি? আকবরের সময় যা হয়েছিল সেটা তাঁর ব্যাক্তিগত চেষ্টা, তাঁর জনকয়েক বন্ধুর চেষ্টা। কিন্তু প্রায় দু'শ' বছর হলো বিজিত হয়েও মুসলমান সমাজ আজো সেই বিজেতা ও বিদেশী মানসিকতা নিয়ে হিন্দুদের পাশাপাশি বাস করছে। আর্যকে দ্রাবিড় ক্ষমা করেছে, কিন্তু মুসলমানকে হিন্দু ক্ষমা করেনি। এর কারণ সমষ্টিগত ভাবে মুসলমান হিন্দুকে প্রসন্ন করেনি। এখনো মুসলমানের সামাজিক মন থেকে যাচ্ছে না যে, সে নিজে গরীব হলে কী হয় তার তুর্কী মামা, তার আরবী চাচা, তার আফগান দাদা বড়লোক। বিজিত হিন্দুদের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক! এরা তো ছোটলোক। আর এই যে ভারতবর্ষ, এও তার মাতৃভূমি নয়—এ তার হারানো জমিদারি। এর প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মেলানো অবান্তর। তার ইসলাম তো তাকে এ কাজে উৎসাহ দিচ্ছে না।

কেমন করে সম্ভব হলো তার ইতিহাস নেই, কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের মুসলমানদের অধিকাংশ কৃষিজীবী ও তাদের বসতি বাংলায় পাঞ্জাবে। কেন যে মাঝখানে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার বাদ গেল, কেমন করে যে লাফ দিয়ে মুসলমান মেজরিটি

পাঞ্জাব থেকে বাংলায় এলো, এর গবেষণা চাই। আবার এই দুটি মেজরিটি কেন যে কৃষিজীবী হলো তাও গবেষণার বিষয়। পাঞ্জাব ও বাংলা ছাড়া অন্য যে সব প্রদেশে মুসলমান বিদ্যমান সে সব প্রদেশে তারা চাষ করে না, গ্রামে থাকে না। অবশ্য এ উক্তির ব্যতিক্রম আছে। সচরাচর সে সব প্রদেশের মুসলমান ভূম্যধিকারী, বাণিজ্যজীবী ও রাজকর্মে নিযুক্ত।

বস্তুতঃ একটা দেশে দুটো সামাজিক কাঠামো থাকতে পারে না। হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে বেচাকেনা করে, হিন্দু মেথর না হলে মুসলমানের চলে না, নাপিতও হিন্দু, ধোপাও। আবার মুসলমানদের এযাবৎ এমন কতকগুলো কাজ একচেটে ছিল যা হিন্দুরা করতে জানত না কিংবা করতে চাইত না। যেমন দর্জি, দপ্তরী, গাড়োয়ান, চামড়ার ব্যাপারী ইত্যাদির কাজ। লস্করের কাজ এখনো মুসলমানদের একচেটে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই জাতীয় একটা সামঞ্জস্য শ্বেত মনুষ্যদের অনভিপ্রেত। সেদেশে তিনটে সমাজ আছে, কিন্তু ব্যবসায়িক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র দিন দিন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। আমাদের দেশে তিনটের বেশী সমাজ আছে—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, পারসী, ইহুদী, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন। কিন্তু আহারবিহার ব্যতীত অন্য কিছু নিষিদ্ধ নয়। যদি ব্যবসায়িক অসহযোগ থাকত তবে হিন্দু মেথর এদের সকলের মল পরিষ্কার করতে চাইত না। তার ফলে মুস্‌লিম মেথর, খ্রীস্টান মেথর, পারসী মেথর ইত্যাদির উদ্ভব হতো।

(১৯৩৪)

ডিক্‌টেটরশিপ

১

ডিক্‌টেটরশিপ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে তা ব্যক্তি-বিশেষের সর্বময় কর্তৃত্ব নয়। ডিক্‌টেটর নন সীজর। মুসোলিনিকে নেপোলিয়ন-বর্গীয় বলে মনে করলে ভুল করব। ডেমক্রেসীর সঙ্গে ডিক্‌টেটরশিপের পার্থক্য হচ্ছে দ্বৈতের সঙ্গে অদ্বৈতের। ডেমক্রেসীর দুই পক্ষ। এক পক্ষের নাম পার্টি ইন পাওয়ার। অপর পক্ষের নাম পার্টি ইন অপোজিশন। ডিক্‌টেটরশিপ অপোজিশন সইতে পারে না, তাই অপর পক্ষ ছেদ করে নিরঙ্কুশ হয়। ডিক্‌টেটরশিপ হচ্ছে ডানা-কাটা ডেমক্রেসী। তার যিনি কর্ণধার তিনি পার্টির তেজে তেজীয়ান, পার্টির থেকে বিচ্ছিন্ন নয় তাঁর সত্তা। তিনি রাষ্ট্রের ডিক্‌টেটর হলেও পার্টির ডিক্‌টেটর নন। ব্যক্তিত্ব যদি তাঁর থাকে তবে তা নিতান্ত আকস্মিক, না থাকলেও অচল হত না। যেমন কনস্টিটিউশনাল রাজার।

আসল কথা দুই হাতে যে তালি বাজে তার নাম ডেমক্রেসী। আর এক হাতে যে কাঁসি বাজে তার নাম ডিক্‌টেটরশিপ। হাত এ স্থলে পার্টি। উভয়েরই প্রাণ পার্টিগত। পার্টিকে নির্মূল করে দাও, দেখবে ডেমক্রেসীও নেই, ডিক্‌টেটরশিপও নেই।

পক্ষান্তরে পার্টিকে ডালপালা মেলতে দাও, একদিন পারে হয় ডেমক্রেসী নয় ডিক্‌টেটরশিপ। একই বীজ থেকে কী করে দুই জাতের চারা হতে পারে তা আমাদের সকলের জেনে রাখা ভালো। নইলে বুনব ডেমক্রেসী আর ফলবে ডিক্‌টেটরশিপ।

২

ইংলণ্ডে যখন রাজার হাত থেকে প্রজার হাতে ক্ষমতা আসে তখন প্রজাদের দুই দল দাঁড়িয়ে যায়। তাদের এক পক্ষ নেয় রাজার অংশ, করে শাসন। অপর পক্ষ নেয় প্রজার অংশ, করে সমালোচনা। চক্রের আবর্তনে সমালোচকরাও শাসক হয়, শাসকরাও হয় সমালোচক। তারা পালা করে ক্রিকেট খেলে, কখনো এর হাতে ব্যাট ওর হাতে বল, কখনো ওর হাতে ব্যাট এর হাতে বল। হুইগ ও টোরি এই দুই দল ওস্তাদ খেলোয়াড় ইংলণ্ড সরগরম করে তুলল, অন্যান্য দেশেও সাড়া পড়ে গেল। সবাই বলল আমাদেরও অমন দুটি টিম চাই। উঠল ডেমক্রেসীর জয়ধ্বনি।

ইংরাজের মতো সবাই তো ক্রিকেট বোঝে না। অন্যান্য দেশে টিম তৈরি হলো বটে, কিন্তু দুটি নয়, তার বেশী। জোড়াতালি দেওয়া দলের খেলা ঠিক ইংরাজী খেলা নয়। তা হলেও তা খেলা। তা পার্লামেণ্টারী গবর্নমেণ্ট।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র জগৎ যখন ডেমক্রেসীর নাম জপছে তখন এক বেসুরা গলায় উচ্চারিত হল, ডিক্‌টেটরশিপ।

রসভঙ্গকারীর নাম কার্ল মার্ক্‌স্। কার ডিক্‌টেটরশিপ? কোনো ব্যক্তিবিশেষের? না। প্রোলিটারিয়াটের। শ্রমিক-গোষ্ঠীর।*

মার্ক্‌সের মতে রাজার ক্ষমতা প্রজার হাতে এসেছে বটে, কিন্তু প্রজা এ ক্ষেত্রে কেবল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। পার্লামেণ্ট হয়েছে তাদের পাঁঠা। সেটাকে তারা যেমন ইচ্ছা কাটছে। তাতে শ্রমিক শ্রেণীর প্রবেশ নেই, প্রবেশ থাকলেও স্বার্থসিদ্ধির ভরসা নেই। শ্রমিক কী চায়? কোন পক্ষ কত দৌড় করল? কয়টা ছোট ছোট উপকার করল? না। শ্রমিক চায় সে তার শ্রমের সম্পূর্ণ মূল্য পাক। যারা তাকে তার ষোলো আনা পাওনার জায়গায় পাঁচ আনা দিয়ে বলে, খুব পেয়েছে, যারা তার বকেয়া এগারো আনা পকেটে পুরে বড় লোক, তাদের সঙ্গে পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে তর্ক করা বৃথা। তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ না করে তাদের সোজা বিদায় কর। কেড়ে নাও তাদের হাত থেকে ক্ষমতা। নির্বাচনে জয়লাভ করে নয়। সরাসরি গায়ের জোরে। রাষ্ট্র পরিচালনা ছেলেখেলা নয়, ক্রিকেট নয়। যারা শ্রম করবে না তারা বাঁচবে না। তাদের বাঁচা বারণ। আর যারা শ্রম করবে তাদের কী নিয়ে দলাদলি হতে পারে? তাদের নিয়ে যে সমাজ তাতে একাধিক দলের স্থান নেই।

মার্ক্‌সের সময় থেকে ডিক্‌টেটরশিপের আইডিয়া ডেমক্রেসীর আইডিয়ার সপত্নী হলো, কিন্তু তার প্রতি বিশেষ কেউ ভ্রূক্ষেপ করেননি। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের শ্রমিকরা পার্লামেণ্টে

প্রবেশ করতে টোরি হুইগের মত পার্টি খাড়া করল, নির্বাচনের আসরে নামল। ধীরে ধীরে তারা দলে ভারী হয়ে একদিন আপোজিশনের আসন নিল। তারপরে ব্যাট ধরল। হুইগ বনাম টোরির খেলায় হুইগ দলে ফাটল দেখা দেয়, য়্যাস্কুইথ ও লয়েড জর্জ পৃথক হয়ে যান। ফলে উভয় উপদল নগণ্য হয়। লেবার লিবারলের বদলে খেলার আসর জমায়।

ইংলণ্ডের লেবার পার্টির অনুরূপ জার্মানীর সোশ্যাল ডেমক্রাট পার্টি। অন্যান্য দেশে বিশুদ্ধ সোশ্যালিস্ট পার্টি। এদের সকলেরই পলিসি পার্লমেণ্টে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হয়ে টোরি বা হুইগের মত রাষ্ট্র শাসন করা। অর্থাৎ বিপক্ষকে খেলায় আউট করে তার ব্যাট ধরা। এরা বিপক্ষকে খেলার মাঠ থেকে খেদিয়ে দিতে চায় না, এরা চায় ওরা বল ছুঁড়ুক। সমালোচনায় এদের আপত্তি নেই, এরা অপোজিশনের রসগ্রাহী।

মাঝখানে একটা মহাযুদ্ধ না ঘটে গেলে ডেমক্রেসীর উপর জনগণের আস্থা অচলা হয়ে রইত। কোনো দেশেই ডিক্‌টেটর-শিপের প্রশ্ন কাফিখানা বা লেখকের দপ্তর ছাপিয়ে উঠত না। কিন্তু মহাযুদ্ধের দিন ইংলণ্ডের মতো খেলোয়াড়ধর্মী দেশেও ডেমক্রেসীর খেলার ভোল বদলায়। য়্যাস্কুইথকে গুরুদক্ষিণা দিয়ে লয়েড জর্জ কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গড়লেন। সমালোচনা করবার জন্যে কেউ রইল না। সকলের এক তনু এক মন এক ধ্যান। অপোজিশনের অভাব যদি হয় ডিক্‌টেটরশিপের সংজ্ঞা তবে ইংলণ্ডে এই সময় ডিক্‌টেটরপিশই স্থাপিত হয়েছিল।

ডিক্‌টেটরশিপের লক্ষণ এই যে তার অধীনে ব্যক্তির অধিকার সঙ্কুচিত হয়, ব্যক্তিকে স্বাধীন বলে গ্রাহ্য করা হয় না। মহাযুদ্ধের আমলে ইংলণ্ডের মানুষ যা খুশি করতে পারত না, যা খুশি বলতে পারত না। খবরের উপর সেন্সরশিপ, খাবারের উপর ভাগ-বাঁটোয়ারা, আলোর উপর নির্বাণের আদেশ, সব জিনিসের উপর খাজনা। গবর্নমেণ্ট নিজেই গোলাবারুদের কারখানা চালান, অন্য অনেক ব্যবসার উপর গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ চলে। যার ইচ্ছা নেই তাকেও পাকড়িয়ে সেপাই করে যুদ্ধে পাঠানো হয়, তার বিবেকের বাধা থাকলে কয়েদ করা হয়।

ইংলণ্ডের মতো বনেদী ডেমক্রেসীও যুদ্ধের দিনে ফেল মারল। শুধু যুদ্ধের দিনে নয়। ডিপ্রেশন যখন ঘনিয়ে এল তখন ম্যাক্‌ডোনালডের নেতৃত্বে সমস্ত কনসারবেটিব, সমস্ত লিবারল ও বহু সংখ্যক সোশ্যালিস্ট মিলে ন্যাশনাল গবর্নমেণ্ট পত্তন করলেন। নামমাত্র একটি বিপক্ষ দল রইল, তাদের মৃদু স্বরের সমালোচনা দুর্বলের প্রতি অনুগ্রহ করে শুনলেন কর্তারা, কিন্তু কর্মের ইতরবিশেষ লক্ষিত হল না। সুখের বিষয় ইংলণ্ডকে এই ডিপ্রেশন জখম করতে পারেনি, যেমন করেছে আমেরিকাকে। যদি করত তবে ব্যবসার উপর দস্তুরমত হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হত।

৩

মহাযুদ্ধে যখন ক্রিকেটের জন্মভূমির এই দশা তখন অন্যে পরে কা কথা। মার্ক্সের মানসকন্যা রুশকে মাল্যদান করলেন। নির্জলা ডিক্টেটরশিপ Tsarএর মসনদ দখল করল।

বোলশেবিক রুশ একালের প্রথম নিরাবরণ ডিক্টেটরশিপ। ইংলণ্ডে যা অল্পের উপর দিয়ে গেল, রুশে তা ষোলো কলায় পূর্ণ হলো। অন্নের ভাণ্ড রাষ্ট্রের হাতে। বস্ত্রের ভাণ্ডার রাষ্ট্রের জিম্মায়। গহনার বাক্স রাষ্ট্রের সিন্দুকে। একটি পয়সাও কারুর পকেটে নেই। বাঁচান বাঁচি মারেন মরি, বল ভাই ধন্য রাষ্ট্র। নিজেকে ব্যক্তি বলে ভাবাটাও রাষ্ট্রদোহ, সমষ্টির অকল্যাণ।

সবচেয়ে বড় কথা, কোনো সমালোচক রইল না। দেশে কেবল একটি বাণী, একটি সুর, একটি সত্য। তার প্রতিবাদ নেই। তার সংশোধন নেই। বিপক্ষের সংবাদপত্র বাহির হয় না, বই ছাপা হয় না, বক্তৃতা উচ্চারিত হয় না। বিপক্ষীয়রা হলো নির্বাসিত, কারারুদ্ধ, নিহত। সব জমিই খাসমহল, সব ব্যবসাই খাস ব্যবসা, সব কারখানা খাস কারখানা। এর সামান্য ব্যতিক্রম স্থলে স্থলে অনুমোদিত হলেও আইনে স্বীকৃত হলো না। ভোগোপকরণের উৎপাদনে ও বিতরণে রাষ্ট্রের কেউ প্রতিযোগী নয়, কোনো প্রতিযোগী নেই। ঘরেবাইরে নিরঙ্কুশ হয়ে রাষ্ট্র স্থির করল প্ল্যান করে সেই বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের অশন-

বসনের অভাব পূরণ করবে। সমস্ত ব্যক্তির সংহত প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের নির্দেশে ধন সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্র জোগাবে মূলধন, ব্যক্তি জোগাবে শ্রম, রাষ্ট্র জোগাবে দিশা, ব্যক্তি জোগাবে মনীষা। ব্যক্তির পারিশ্রমিক বিভিন্ন হবে, কিন্তু সেই পারিশ্রমিককে মূলধনে পরিণত করা নিষিদ্ধ। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে খাটাতে পারবে না। অপরের জন্যে খাটতে পারবে না। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র প্রত্যেককে কাজ দেবে, খোরাক দেবে।

এখন এই ব্যবস্থা একদা ডেমক্রেসীর সাহায্যেও সাধিত হতে পারত। সেই সুদিনের অপেক্ষায় বসে থাকতে মার্কসপন্থীরা রাজি নয়, তাই তারা দিনটাকে সরাসরি উপায়ে এগিয়ে নিল। তাদের কৈফিয়ৎ এই যে মধ্যবিত্তরা ভোটে হেরে রাষ্ট্রের পায়ে সম্পত্তি সমর্পণ করবার পাত্রই নয়, ভোটে হারজিৎ তাদের ঘরোয়া তামাশা, তার সুযোগ নিয়ে অন্য শ্রেণীর লোক যে তাদের ঘর সংসার বেদখল করবে এর সম্ভাবনা দেখলে তারা তামাশার টিকিট বেচবে না, জুয়াখেলায় বাজি রাখতে দেবে না। তার মানে ডেমক্রেসীর আটঘাট বেঁধে তাকে নিজেদের পক্ষে নিরাপদ করে তুলবে। আধুনিক পরিভাষায় তাদের ডেমক্রেসী সেফগার্ডে সমাচ্ছন্ন পর্দানশীন সাজবে।

৪

মার্কস্‌পন্থীদের আশঙ্কা অমূলক নয়। তার প্রমাণ ধীরে ধীরে পাওয়া যাচ্ছে। অথচ তাদের আশঙ্কার প্রতিষেধকরূপে

তারা যে উদ্‌ভাবন করেছে তা এমন সদ্যফলপ্রদ যে দেশে দেশে তার জাল হতে লেগেছে। রুশবিপ্লবের অনতিকাল পরে ইটালীতে ফাসিস্ট ডিকটেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফাসিস্টরা পার্লামেণ্ট উঠিয়ে দেবার দরকার দেখল না, রাজারও মাথা কাটল না। চার্চের সঙ্গে একটু ঝগড়া বাধলো বটে, কিন্তু চার্চ অদের স্বার্থে বাদ সাধল না, সুতরাং চার্চের স্বার্থকেও তারা মেনে নিল।

ফাসিস্ট পার্টির উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য ইটালীকে প্রথম শ্রেণীর শক্তির পর্যায়ে উন্নীত করা। ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়া যখন পৃথিবী ভাগ করে নিচ্ছে ইটালী ও জার্মানী তখন বহুধা-বিভক্ত। উপরন্তু ইটালী তখন পরাধীন। অন্যেরা অনেক দূর যাবার পর এই দুই জাতি জাগে। জেগে দেখে তাদের ভাগে বেশী কিছু অবশিষ্ট নেই, আফ্রিকার মাংস নিঃশেষ, খানকয়েক হাড় পড়ে রয়েছে। এশিয়াও পরের গ্রাসে। অবশ্য ঘরের যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হলে চলত। কিন্তু তা হলে প্রথম শ্রেণীতে নাম ওঠে না। প্রথম শ্রেণীই স্বর্গ, প্রথম শ্রেণীই ধর্ম, প্রথম শ্রেণীই পরম তপ। নবজাগ্রত ইটালীর নবপ্রতিষ্ঠিত ডেমক্রেসী আফ্রিকার দিকে হাঁ করল। কিন্তু হাঁ ভরল না। আদোয়াতে আবিসিনিয়ার দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে ইটালী আর ও-মুখো হল না। বলকান যুদ্ধের মরসুমে তুর্কীর কাছ থেকে ত্রিপোলী কেড়ে নিয়ে সে কোনো মতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেল বলা চলে। মহাযুদ্ধে তার মহদ্‌ভোজ্য সমুপস্থিত হয়, তার বিভীষিকার

হেতু অস্ট্রিয় সাম্রাজ্য চূর্ণ হয়ে যায়। আড্রিয়াটিক সাগরের বন্দর তো সে আহার করলই, অধিকন্তু দক্ষিণ টিরোল দক্ষিণা পেল। বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া রাশিয়া ও তুর্কীর যে প্রতিপত্তি ছিল একা ইটালী তার সবটা করায়ত্ত করল। অস্ট্রিয়ার জাহাজগুলি বগলদাবা করে ভূমধ্যসাগরে ইটালীর ভার বাড়ল। ওদিকে জার্মানীর বাণিজ্যের একাংশ তার ভাগ্যে জুটেছে। এক কথায় ইটালীর সামনে সীমাহীন আশা, প্রাণে সদ্যলব্ধ সাহস। অন্ধ যেন দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে, খঞ্জ ফিরে পেয়েছে চলৎ-শক্তি।

বাছুরের নতুন শিং উঠেছে, সে যত্র তত্র ঢুঁ মারবার জন্যে অধৈর্য। সংখ্যাভুয়িষ্ঠ হবার জন্যে ইটালীর ফাসিস্ট দলের ত্বর সইল না। রাশিয়ার বোলশেবিকদের দৃষ্টান্ত ছিল চোখের সুমুখে। রোমান ক্যাথলিক চার্চের আদর্শও নিত্য পরিচিত। এবং এমন আশঙ্কাও ছিল যে কমিউনিস্ট দল বাহুবলে রাষ্ট্র অধিকার করবে। ডিক্‌টেটরশিপ যদি ইটালীর কপালে লেখা থাকে তবে কমিউনিস্ট ডিক্‌টেটরশিপ কেন? ফাসিস্ট ডিক্‌টেটরশিপ কেন নয়? ফাসিস্টরা কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করল। অবিকল কমিউনিস্ট পদ্ধতি দিয়ে কমিউনিস্টকে পরাস্ত করল। যেন জিউজুৎসু দিয়ে জাপানীকে। মাঝখান থেকে মারা পড়ল বেচারা উলুখাগড়া লিবারলরা। সোশ্যালিস্টরা বেকুব বনল। ডেমক্রেসীর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও ঘটল প্রাণান্ত। ফাসিস্টরা বিরুদ্ধবাদীমাত্রকেই টিপে টিপে মারল, সরাল, তাড়াল, বাঁধল। অপোজিশানের নামগন্ধ রাখল না।

আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে, ফাসিস্টদের উদ্দেশ্য কী ? উদ্দেশ্য স্বদেশের শক্তিবৃদ্ধি। এর জন্যে রাষ্ট্রকে দিয়ে যা-কিছু করানো সম্ভব তাই করণীয়। রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে বাঘকে হরিণকে এক ঘাটে জল খাওয়াতে পারে। রাষ্ট্রের চাপে ধনিক ও শ্রমিক আপোস করল। রাষ্ট্র সাহায্য করল উভয়কেই। কারুর সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে খাস করতে হলো না, সকলের সম্পত্তির উপর ক্ষমতা জাহির করাই যথেষ্ট বোধ হলো। একটা উদাহরণ দিই। ইটালীতে বেড়াবার সময় লক্ষ্য করেছি হোটেলের প্রত্যেক ঘরে ফ্যাসিস্ট পার্টি একখানি কাগজ এঁটে দিয়েছে, তাতে লেখা আছে ঘর ভাড়া এত, বিদ্যুতের ভাড়া এত, মিউনিসিপাল ট্যাক্স এত ইত্যাদি। মনোযোগের বিষয় এই যে রাষ্ট্র নয় ফ্যাসিস্ট পার্টির স্থানীয় কর্তৃপক্ষই এই সব হোটেলের মা বাপ। পার্টি রাষ্ট্র দখল করেছে বলে নিজের দুর্গ ছাড়েনি। ওটুকু রানীর স্ত্রীধন।

যুদ্ধকালীন ইংলণ্ডের সঙ্গে ফাসিস্ট ইটালীর তুলনা সর্বাধিক সঙ্গত। ফাসিস্টরাও বলে তাদের ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা, যুদ্ধ জগতের সনাতন ধর্ম, তা শান্তির দিনেও অন্য আকারে রয়েছে। প্রাণে মারার চেয়ে ভাতে মারা কম মারাত্মক নয়। বিদেশী মালের উপর শুল্ক চড়িয়ে শান্তির দিনেও এক দেশ অন্য দেশের অন্ন মারছে। আবার দেশী মালের ব্যবসাদারকে অর্থ-সাহায্য করে সেই সব মাল সস্তায় বিদেশী হাটে চালান দিয়েও বিদেশীর অন্ন কাড়ছে। এই অন্নযুদ্ধ কি কম হিংস্র ? এ কি কোনো অংশে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু ?

ইংলণ্ডে যা ছিল আপদ্ধর্ম ইটালীতে তাই সনাতন ধর্ম, যেহেতু আপদ হচ্ছে সনাতন। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ, শান্তির সময় অন্নযুদ্ধ, সব সময় এক প্রকার না এক প্রকার যুদ্ধ। সুতরাং ফাসিজম্ ইটালীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। সেদেশের অন্য বাণী হতে পারে না, অন্য সুর হতে পারে না, অন্য সত্য হতে পারে না। ইংলণ্ডের লোক যা দু' বছরের বেশী বরদাস্ত করতে পারে না ইটালীর লোক তা তেরো বছর পছন্দ করে এসেছে।

ইটালীতে পার্লামেণ্ট আছে, কিন্তু তাতে মেজরিটি মাইনরটি নামক দুই দল নেই। তাতে আছে বিভিন্ন ও বিচিত্র স্বার্থের নির্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি। তারা সমালোচনা করে না, তাদের কেউ মন্ত্রীপদ পাবার অধিকারী নয়। মন্ত্রীপদ ফাসিস্ট পার্টির লোককে পার্টির দান। রাশিয়াতে পার্টির কর্তারা রাষ্ট্রের কর্তাদের নিযুক্ত করেন, লোকপ্রতিনিধিদের ইচ্ছা খাটে না।

৫

ইটালীর অকারণে যেসব দেশে ডিক্‌টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা হয় তাদের মধ্যে জার্মানীই উল্লেখযোগ্য। পোলণ্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশে পিলস্যুড্‌স্কি প্রিমো প্রভৃতি ব্যক্তি সৈন্যদলকে হাত করে রাষ্ট্রের গাড়োয়ান হয়েছিলেন, তেমন তো অহরহ দক্ষিণ আমেরিকায় ঘটছে। তুর্কী ও ইরানের নায়কদের সম্বন্ধে আর একটু বেশী বলা যায়, তাঁরা নেপোলিয়ন-বর্গীয়।

বোলশেবিক ও ফাসিস্ট পার্টির মতো জার্মানীর ন্যাশনাল

সোশ্যালিস্ট পার্টি। ওরফে নাৎসী পার্টি। এই পার্টির পত্তন যুদ্ধের অল্প পরে। অথচ ক্ষমতা আয়ত্ত করতে এদের দীর্ঘকাল লাগল। ফাসিস্টদের যেমন ভয়ের কারণ ছিল যে ওরা না হলে কমিউনিস্টরা ডিক্‌টেটর হবে নাৎসীদের তেমন আজুহাতও ছিল না। এদের পথ পরিষ্কার করে দিল সোশ্যাল ডেমক্রাট ও কমিউনিস্টদের গজকচ্ছপ কলহ। এরা গরুড়ের মতো দুটোকেই ভক্ষণ করে অসপত্ন হল। বোলশেবিক ও ফাসিস্টকেও এরা বিপক্ষদলনে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু এরা সহজে নিষ্কণ্টক হতে পারছে না। প্রথমত কমিউনিস্ট পার্টিকে নিঃসত্ব করলেও কমিউনিস্ট-ভাবাপন্ন ব্যক্তি নিশ্চিহ্ন হয় না জার্মানীর মতো কমিউনিস্ট তীর্থে! নিকটে রাশিয়া। তার ছোঁয়াচকে অতিমাত্র ভয়। দ্বিতীয়ত ইহুদীর সংখ্যা কেবল যে ছয় লাখ তাই নয়, তারা সর্বঘটে বিদ্যমান ও সর্বত্র তারা জাতজার্মানের চেয়ে স্ববস্থাপন্ন ও উন্নতিপরায়ণ। তাদের সঙ্গে মিশ্রণ সম্ভব নয় বলে তারা চিরকালই রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র হিসাবে দ্রোহিতা করবে। বিশেষত তাদের মিত্র ইউরোপের সব দেশে। জার্মানীর শত্রু-রাজ্যের যদি তারা চর হয়, যদি গোপনে তাদের আত্মীয়দের কাছে স্বর্ণ রপ্তানী কিংবা তাদের কাছ থেকে নিষিদ্ধ পণ্য আমদানী করে, যদি যুদ্ধের দিনে পরের পক্ষে চক্রান্ত করে, তবে দেশ বিপন্ন হবে। ইহুদীদের অনেকে কমিউনিস্ট, একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ। নাৎসীরা ইহুদীকে আমেরিকার নিগ্রোর মতো দীনহীন দশায় উত্তীর্ণ না করে ছাড়বে না। ওদের দেশে দেশে

আপনার লোক রয়েছে, আন্দোলন করে জার্মান পণ্যের বাজার খারাপ করে দিচ্ছে। তৃতীয়ত জার্মানীর ক্যাথলিকরা পার্লামেণ্টেও প্রতিনিধি পাঠায়, তাদের একটা স্বতন্ত্র পার্টি আছে। ধর্মের নামে পলিটিকল পার্টি কেবল ভারতে নয় জার্মানীতেও রয়েছে, তা নইলে ওদেশের এমন দুর্দশা হবে কেন? এখন ইহুদীর মতো ক্যাথলিকও অন্যান্য দেশে আছে, তাদের সঙ্গে জার্মানীর ক্যাথলিকদের ভাব থাকা ভালো নয়। জার্মানীর মহাশত্রু ফ্রান্স আবার ক্যাথলিক কিনা। তদ্ব্যতীত রোমের পোপ জার্মানীর ক্যাথলিকদের ব্যাপারে কথা কন। এক্ষেত্রেও সেই রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র। এ জন্যে নাৎসীরা ক্যাথলিকদের প্রতি বিরূপ। এরাই কতকটা অপোজিশনের কাজ করছে। এমনি কপাল যে প্রোটেস্টাণ্টদের সঙ্গেও নাৎসীদের বনছে না। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট উভয়কে এক সূত্রে গেঁথে একটা "দীন এলাহী" প্রবর্তন করতে এ যুগের আকবর বাদশাহের সখ। গ্যয়রিং আবার প্রাক্‌খ্রিশ্চান পেগান যুগকে ফিরিয়ে আনতে চান।

নাৎসীদের মর্মগত উদ্দেশ্য কী? ইতিহাসের মঞ্চে তারা কোন ভূমিকায় অভিনয় করতে অবতীর্ণ? এর উত্তর তারা জার্মানীকে পুনরায় মহাশক্তির আসনে বসাতে কৃতসঙ্কল্প। যুদ্ধে জার্মানী পরাভূত হয়েছে, এই তথ্যটাকে তারা ইতিহাসের পাতা থেকে রবার দিয়ে মুছে ফেলতে পণ করেছে। সেই সঙ্গে অন্যান্য গবর্নমেণ্টের মতো তারা বেকারসমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিয়েছে।

ভাবী যুদ্ধের আয়োজনে জার্মানী যা খরচ করেছে তাতে বেকার সংখ্যা হ্রাস হয়েছে। দেশরক্ষার্থে বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে সর্ব্বস্বীকৃত। তাদৃশ কারণে সংবাদের, অভিমতের ও আর্টের নিয়ন্ত্রণও মাথা পেতে নিতে হয়। নাৎসী জার্মানীতে ব্যক্তির স্বাধীনতা ফাসিস্ট ইটালী ও বোলশেবিক রাশিয়ার মতো রাষ্ট্রের স্বার্থে বিলীন হয়েছে, জীবাত্মা যেমন পরমাত্মায়।

ব্যক্তির তো এই জীবন্মুক্ত দশা। নাৎসী পার্টি কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করছে, রাষ্ট্রভার গ্রহণ করে আত্মদেহ ত্যাগ করেনি।

রাশিয়া, ইটালী ও জার্মানী এই তিন দেশেই রাষ্ট্র ব্যক্তিকে নিজের জারক রসে জীর্ণ করেছে, কিন্তু পার্টিকে উদরস্থ করতে পারেনি, বরং পার্টিই রাষ্ট্রের পিঠে সওয়ার হয়েছে। এইখানেই ডিক্‌টেটরশিপের ভণ্ডামি। তিন দেশেই ডিক্‌টেটরশিপ রাষ্ট্রের মহিমা গান করছে, রাষ্ট্রের চেয়ে বড় নেই, না ভগবান না ধর্ম। নমো রাষ্ট্র নমো রাষ্ট্র বলে ত্রি সন্ধ্যা উপাসনা করতে হবে, রাষ্ট্র নামক অব্যয় অক্ষয় পরব্রহ্মের চরণে আপনার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব নিবেদন করে চরণামৃত সেবন করতে হবে। তা হলে যে অপূর্ব আনন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ হবে তাই হচ্ছে ইহজীবনের সার্থকতা। এই যাদের মতবাদ, যাদের ফিলসফি, তারা কিন্তু পার্টিকে শিকায় তুলে রেখে দিয়েছে ঠাকুরের ঠিক মাথার উপরে। অন্যান্য দেশে এই ফলার চুরি নেই। এর থেকে অনুমান হয় যে পার্টি বাইরে থেকে রাষ্ট্রের লাগাম কেড়ে নিয়েছে, ভিতর থেকে তার মন

কাড়তে পারেনি। নাৎসী ফাসিস্ট ও বোলশেবিক নিজ নিজ দেশের সমস্ত মানুষকে পার্টির সদস্য করতে সাহসী নয়, কারণ সেক্ষেত্রে ভোটের মর্যাদা আছে, ব্যক্তির মতামতের মূল্য আছে, যদি অধিকাংশের আনুকূল্য না পাওয়া যায় তবে পার্টির পলিসি পণ্ড হবে ও নেতৃত্ব পাত্রান্তরিত হবে।

৬

শেষপর্যন্ত দাঁড়াল এই যে মঙ্গলের জন্যে গৌরবের জন্য পরাভবগ্লানি ধৌতকরণের জন্যে মুষ্টিমেয়ের নেতৃত্বে মহাজনতাকে চালিত হতে হবে। সঙ্কল্প অল্পের, সমর্পণ অধিকাংশের। রাষ্ট্র হচ্ছে জগন্নাথের রথ, জনসাধারণ তাকে টানবে, পার্টি হবে তার পাণ্ডা। এ যদি দুর্দিনের ব্যবস্থা হতো তবে ডেমক্রেসীর পক্ষে ভয়াবহ হতো না, কিন্তু যেমন দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় উক্ত তিনটি দেশে এই ব্যবস্থা সুদিনেও অটুট থাকবে, যাতে অটুট থাকে তার জন্যে পার্টি আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অপিচ ঐ তিন দেশে এর সাফল্য একে অন্যত্র সংক্রামক করতেও পারে। অতএব ডিক্‌টেটরশিপ ডেমক্রেসীর স্থায়ী প্রতিযোগী হতে উদ্যত হয়েছে। হয় ডিক্‌টেটরশিপ জিতবে, ডেমক্রেসী। দুটোর প্রভেদ যাঁরা বোঝেন না তাঁদের ষত্ব ণত্ব জ্ঞান নেই। ডেমক্রেসী হচ্ছে সংখ্যাভূয়িষ্ঠের শাসন, ডিক্‌টেটরশিপ সংখ্যালঘিষ্ঠের।

সম্প্রতি ইংলণ্ডেও ডিক্‌টেটরশিপের আইডিয়া বহু মনীষীর মনঃপূত হয়েছে। আমি অস্‌ওয়াল্‌ড্‌ মস্‌লের কথা ভাবছিনে, ভাবছি ক্রিপ্‌স্‌ কোল লাস্কির কথা। এঁরা ডেমক্রেসীর ঠাট

বজায় রেখে ডিক্‌টেটরশিপের প্রাণবস্তু চান। এঁদের প্রস্তাব এই যে লেবার পার্টি সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হয়ে পার্লামেণ্টে আসুক, এসে ভোটের জোরে বিনা সময়ক্ষেপে রাতারাতি ব্যাঙ্ক, খনি, রেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ব্যবসায় রাষ্ট্রের খাসদখলে আনুক।

এই প্রস্তাব শুনে প্রতিপক্ষ হেসে বললেন, ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ক্রিকেট নয়। সমালোচনার সময় দিতে হবে। পদে পদে জবাবদিহি করতে হবে। দেশের লোককে ফলাফল অনুধাবন করবার অবসর দিতে হবে। রাতারাতি একটা সুপ্রতিষ্ঠিত দেশের একতরফা ওলটপালট ঘটানোর জন্যে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করা পার্লামেণ্ট ধ্বংস করার সামিল। তোমরা যদি ভোটের জোরে অন্যায় করতে উদ্যত হও আমরাও গায়ের জোরে অন্যায়কে ঠেকাতে জানি।

এঁরা প্রত্যুত্তর করলেন, দেশের লোক যদি আমাদের সংখ্যাভূয়িষ্ঠরূপে পাঠায় তবে ধরে নিতে হবে যে আমাদের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ভালো করে বুঝসুঝেই আমাদের পাঠিয়েছে। আমরা ম্যাণ্ডেট পালন করছি মাত্র।

এই যুক্তির দ্বারা আদালতে মামলা জেতা যায়, কলেজে ছেলে ভোলানো যায়। কিন্তু এ ক্রিকেট নয়। কোনোমতে একবার সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হলেই যে ডালে বসেছি সে ডাল কাটবার অধিকার জন্মায় না। গোড়া ঘেঁষে কোপ মারার প্রস্তাব সর্বসাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য হওয়া দরকার। সংখ্যাভূয়িষ্ঠ তো চিরদিন সংখ্যাভূয়িষ্ঠ

নয়। পাঁচ বছর পরে তারাই হতে পারে সংখ্যালঘিষ্ঠ। সমাজ ব্যবস্থা কি প্রতি পাঁচ বছরে বিপরীত হবে? কাটা ডাল গজাবে কি?

মোট কথা ডেমক্রেসী বিপ্লবের বাহন নয়। কামারের দোকানে দইয়ের ফরমাস বৃথা। মার্ক্‌স্‌ এ সত্য জানতেন বলে তাঁর শিষ্যদের সোজাসুজি বিপ্লবের পরামর্শ দিয়ে গেছেন। লেবার পার্টি কনফারেন্সে মনীষীদের এই প্রস্তাব সহজবুদ্ধির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হল। এতে আছে ডিক্‌টেটরশিপের সারবস্তু। লেবার ডিক্‌টেটশিপের থেকে শত হস্ত দূরে থাকতে ব্যগ্র। কারণ লেবার ডিক্‌টেটর হবার উপক্রম করছে টের পেলে তার আগে প্রতিপক্ষ ডিক্‌টেটর সেজে বসবে। গায়ের জোর প্রতিপক্ষের বেশী। প্রেস প্রতিপক্ষের হাতে। সাফাই সৃষ্টি করা একান্ত সোজা। ব্যাঙ্ক প্রতিপক্ষের হাতে। আতঙ্ক সৃষ্টি করা কয়েক মিনিটের কর্ম। লেবার জানে যে তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে—ক্রিকেট খেলাই নিরাপদ, তাতে মাঝে মাঝে ব্যাট ধরবার সুযোগ মেলে।

৭

ডিক্‌টেটরশিপের লক্ষ্য সুস্পষ্ট, সুভেদ্য, নির্দিষ্টকালে নিবদ্ধ। ডেমক্রেসীর কোনো লক্ষ্য নেই। যদি থাকে তবে তা মৃদু মন্থর প্রগতি। ডিক্‌টেটরশিপ বলে, সাত বছর সময় দাও। জার্মানীকে

পরাক্রান্ত ও নিরভাব করে দিচ্ছি। পাঁচ বছর সময় দাও। রাশিয়া শিল্পপ্রধান দেশ হবে; যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে বহুগুণ ফসল ফলবে। দশ বছর সময় দাও। ইটালী উপনিবেশ জয় করে নেবে। ডেমক্রেসী তেমন কোনো অঙ্গীকার করে না। প্রত্যেক নির্বাচনে প্রত্যেক দল কার্যতালিকা দাখিল করে বটে, কিন্তু সে সব খুচরা ঘরমেরামতি, তাতেও তারা ঢিলে দেয়। তাদের দোষ নেই। গৃহস্থ যে ট্যাক্স দেয় সেই খরচে তার বেশী হয় না। ট্যাক্স বাড়াবার নাম করলে নির্বাচনে মাৎ হতে হবে, বাড়ালেও পরবর্তী নির্বাচনে ইটপাটকেল ভাঙা বোতল পচা ডিম দিয়ে সম্বর্ধনা করবে দেশের লোক।

বলা যায় না ডিক্‌টেটরশিপ যদি লক্ষ্যভেদে অক্ষম হয় তবে তার সম্বর্ধনা কীরূপ হবে। যারা চড়া পণে জুয়া খেলতে যায় তারা জুয়াড়ির পরিণাম জেনেশুনেই যায়, বিনাশ তাদের অপ্রত্যাশিত নয়। যাঁরা রাশিয়ায় ডিক্‌টেটরশিপের দীর্ঘজীবন অথচ জার্মানী ও ইটালীতে তার অকালমৃত্যু কামনা করেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে তত্রত্য ক্যাপিটালিজমের পতনকামী। তাঁদের সে অভিলাষ ডেমক্রেসী কর্তৃক পূরণ হবে না, তাঁদের মনোগত অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যে ডিক্‌টেটরশিপের মরণ নয় তার লক্ষ্যের পরিবর্তন আবশ্যক। ডেমক্রেসী ক্যাপিটালিজমের মিত্র। তার কাছে সোশ্যালিজ্‌মের প্রত্যাশা আকাশ-কুসুম। তবু এই প্রত্যাশাই অধুনাতন বামমার্গীয় আদর্শবাদীকে বাঁচবার প্রেরণা দেয়। সামঞ্জস্যের ভরসায় সে ধৈর্যের সহিত দিন গুনছে।

তাব বিশ্বাস রাশিয়াতেও একদিন ডেমক্রেসীর সূচনা হবে। সোশ্যালিস্ট ডেমক্রেসী।

ওদিকে দক্ষিণমার্গের আদর্শবাদীর মানসে ক্যাপিটালিজ্‌মের সঙ্গে ডেমক্রেসীর সমাহার নব নব বর্ণে উদ্‌ভাসিত হচ্ছে। ডিক্‌টেটরশিপ তার প্রার্থনীয় নয়, কিন্তু সোশ্যালিজ্‌মের চেয়ে ডিক্‌টেটরশিপ স্পৃহণীয়। সে প্রথমে ক্যাপিটালিস্ট, পরে ডেমক্রাট। ইটালী জার্মানী যেদিন ক্যাপিটালিজ্‌মের পক্ষে নিরাপদ হবে সেদিন ডিক্‌টেটরশিপের পরিবর্তে ডেমক্রেসী সংস্থাপিত হলেই সে প্রীত হবে। সে খেলোয়াড় মানুষ, জুয়াড়ি নয়। ডিক্‌টেটর সম্বন্ধে তার মোহ নেই, আছে বিপৎ কালে নির্ভর।

বিশ্লেষণ করলে দ্বন্দ্বটা মূলত ক্যাপিটালিজ্‌মের সঙ্গে সোশ্যালিজ্‌মের। ক্যাপিটালিজ্‌ম্ তার মিত্রের সঙ্কট দেখলে আত্মরক্ষার জন্যে ডিক্‌টেটরশিপের বায়না দেয়। তা থেকে যদি কেউ সিদ্ধান্ত করেন যে ডিক্‌টেটর তার বরকন্দাজ তবে ভুল করবেন। ডিক্‌টেটরকে যে নিয়োগ করে সে তার। রাশিয়ায় সে প্রোলিটারিয়াটের, ইটালী জার্মানীতে সে ক্যাপিটালিস্টের। সে প্রভুভক্ত গুর্খা ভৃত্য। মালিকের বিচার করে না, যদি খোরাকী পায়। ডেমক্রেসী ভদ্রলোক। ক্যাপিটালিজ্‌ম তাকেই খাতির করে বেশী। কিন্তু সম্পত্তির গায়ে হাত পড়লে লোকে ভালোমানুষ বন্ধুর চেয়ে বিশ্বস্ত লাঠিয়ালের দিকে বেশী ঝোঁকে। সোশ্যালিজ্‌ম্ যখন নূতন দখল

নিচ্ছে তখন লাঠিয়ালই তো তার একমাত্র অবলম্বন। সম্পত্তি রাখতে গেলেও যেমন কাড়তে গেলেও তেমনি, সম্পত্তির বেলায় ভদ্রতা করতে গেলে সর্বনাশ। যে মানুষ দু' বেলা মালা গড়ায় তত্ত্বকথা আওড়ায় নিরামিষ খায় সেও সম্পত্তির জন্যে জাল করে, মিথ্যা জবানবন্দী দেয়, ভাইয়ের গলায় ছুরি চালায়।

অতএব দ্বন্দ্বটা মুখ্যত সম্পত্তিঘটিত।

(১৯৩৫)

শরৎচন্দ্র ঃ বিনুর য্যাডভেঞ্চার

১

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিনুর আলাপ ছিল না। সে মাত্র তিনটি বার তাঁকে দেখেছে। দ্বিতীয় বার রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে। তৃতীয় বার পি. ই. এন. ক্লাবের ভোজে। আর প্রথম বার? সেই কথাই আজ বলবে।

হাওড়া স্টেশন। ট্রেন ছাড়ছে, এমন সময় বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে যে কামরায় বিনু ও তার সহযাত্রিণী উঠে বসলেন সে কামরায় আরো দু'জন ছিলেন। দু'জনেই পুরুষ। যিনি প্রৌঢ় তিনি বার্থের উপর অর্ধশয়ান হয়ে কী যেন বলে যাচ্ছিলেন, আর যিনি যুবক তিনি পায়ের কাছে বসে সমনোযোগে শুনছিলেন।. যুবকটির মনোযোগের ভঙ্গী গ্রামোফোন কোম্পানীর লেবেল থেকে নেওয়া। লক্ষণ দেখে বোঝা উচিত ছিল যে ইনি একজন ভক্ত ও উনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু বিনুর অতটা খেয়াল ছিল না, সে ধরে নিয়েছিল যে পিতা কিংবা পিতৃব্য তাঁর সুপুত্র কিংবা পুত্রপ্রতিমকে বৈষয়িক পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁদের কথাবার্তায় বিনুর কান ছিল না, চোখও ছিল না তাঁদের দিকে। তার আগ্রহের পাত্রী তার পাশেই ছিলেন, আর নবদম্পতির তপোভঙ্গ স্বয়ং দেবাদিদেবেরও অসাধ্য। তবে কিনা স্থানটা হচ্ছে

রেলগাড়ী, আর উপস্থিত ভদ্রদ্বয় ইংরেজীও বোঝেন, সুতরাং… বিনুকে মাঝে মাঝে তাঁদের দিকে চেয়ে সতর্ক হতে হচ্ছিল।

কোনো দরকার ছিল না। কারণ কামরায় যে আর কেউ রয়েছে সেই ধারণাই তাঁদের ছিল না। উনি বলে যাচ্ছিলেন এক নিঃশ্বাসে, ইনি শুনে যাচ্ছিলেন এক নিঃশ্বাসে। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ কানে এলো প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বলছেন তাঁর জ্বর হয়েছে। জ্বর নিয়েই তিনি কুমিল্লা থেকে বেরিয়েছিলেন, বাড়ীতে খবর দেওয়া হয়নি, স্টেশনে যদি কেউ নিতে না আসে তবে কী করে এতটা পথ হাঁটবেন? তার পরে যেন শুনতে পাওয়া গেল, "সভাপতির অভিভাষণ," "ছাত্রদের উৎসাহ" "মিটিংএর কাপড়," এমনি দু'চারটি বচন। ভদ্রলোক নিজেই উদ্‌যোগী হয়ে ইশারায় দেখালেন একটি বিপুল তোরঙ্গ, সেটি নাকি মিটিংএর কাপড় অর্থাৎ খদ্দর দিয়ে ভরা। তিনি না হয় কোনো মতে বাড়ী পৌঁছলেন, কিন্তু তাঁর বোঝাটির কী হবে। বিনুও তাই ভাবছিল, সেটির জন্যে অন্তত চারটি মুটে চাই। যা হোক যুবকটি তাঁকে অভয় দিলেন, ও জিনিস পরের দিন জাহাজে রওনা হবে। আপাতত তিনি ভারমুক্ত।

কিন্তু বোঝাটি না হয় জাহাজে চাপল, ওদিকে যে আরো একটি চীজ আছে। ভদ্রলোক অসুস্থ শরীরে বার্থ থেকে নেমে বাথরুমের দরজা অবধি হেঁটে গেলেন। নিজের হাতে খুলে দেখালেন একটি নয় দুটি নয়, দশটি কি বারোটি বাঁধানো গড়গড়া। এমন আদরের সহিত দেখালেন যেন গড়গড়া নয়, খোকাখুকু।

কোথায় পাওয়া গেল, কী করে পাওয়া গেল, এসব বিষয়ে যা বললেন তা যেন সাধারণ সওদার কাহিনী নয়, আবিষ্কারের য়্যাডভেঞ্চার।

ইতিমধ্যেই বিন্নু অনুমান করেছিল যে ইনি শরৎচন্দ্র। সেই দিন সকালবেলার কাগজে তাঁর কুমিল্লার অভিভাষণ পড়েছিল। প্রতিকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে চিনতে ভুল না হবারই কথা।

সহযাত্রিণীকে জানাল, ইনিই সেই বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎ চট্টোপাধ্যায়।

সহযাত্রিণী বললেন, হাজার লোকের ভিড়েও এঁকে চেনা যায়। চেহারায় লেখা রয়েছে ইনি অসামান্য শিল্পী।

তখন বিন্নু খোদার উপর খোদকারী করল। যিনি কত মানুষের ছবি এঁকেছেন তাঁর ছবি এঁকে নিল। লক্ষ্য করল ভাস্কর্যের মডেল হিসাবে তাঁর মুখের কাট অমূল্য। ভালে প্রতিভার অভ্রান্ত ব্যঞ্জনা। নাসায় অভিজাত্যের নিশান। নয়নে সকরুণ মমতা। মুখের কোনো এক অংশে কী একটা দুর্বলতার আভাস ছিল, বোধ হয় ঠোঁটে। হাবভাব খুবই এলোমেলো, কতকটা জ্বরের দরুন। চুল আলুথালু। কিন্তু বেমানান নয়। বেশভূষা ফিটফাট, জ্বর সত্ত্বেও। চেহারা শুধু আর্টিস্টের চেহারা নয়, আর্টের বিষয়বস্তু।

শরৎচন্দ্র রূপকারও ছিলেন, রূপবানও ছিলেন। তাঁকে দেখে অন্যান্য বারও সেইকথা মনে হয়েছে। কিন্তু তাঁর কথাবার্তায় সাহিত্যের নামগন্ধ ছিল না এবং ছিল না কোনো স্টাইল বা আর্ট।

সেনগুপ্তের গায়ে কারা লাঠি তুলেছে, সুভাষের গায়ে কারা কয়লার গুঁড়ো ছুড়েছে, এমনি কত কথা বলে আফসোস করলেন। তবু তাঁর স্বদেশের তরুণদের উপর আস্থা ছিল অসীম।

সেদিনকার আর একটি প্রসঙ্গ মনে আছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে দেখা করতে চান, কবিরও তাই ইচ্ছা। কিন্তু ভরসা হয় না, ভয় করে। বড় মানুষ, কী জানি কেমন ব্যবহার করবেন। কী বলো, তোমার কী মনে হয়!

যুবকটি কী উত্তর দিয়াছিলেন স্মরণ নেই। তবে কবিকে বিন্নু চিনত, কবির পক্ষে যা বলা সম্ভবপর তা বিন্নুই হয়তো বলতে পারত। এই সূত্রে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করবার অভিলাষ পূর্ণ হতো। কিন্তু কবির সম্বন্ধে তাঁর যে সংশয় তাঁর সম্বন্ধে বিন্নুরও সেই সংশয়। কী জানি কেমন ব্যবহার করেন। তা ছাড়া সে চিরদিন লাজুক, বিশেষত অসমবয়সীর সামনে। এবং আরো একটা কারণ ছিল, সেইটে আসল। শরৎচন্দ্রের কথনে এক মুহূর্ত বিরাম ছিল না, যুবকটি কেবল সায় দিচ্ছিলেন বা স্তোক দিচ্ছিলেন। ফস্ করে পরের কথায় কথা কওয়া বিন্নুর অসাধ্য না হলেও তাঁদের অসহ্য হতো।

গাড়ী থামতেই তাঁরা নেমে গেলেন। তোরঙ্গটা নামাতে এক দল কুলী কামরায় ঢুকল। যতদূর মনে পড়ে, গড়গড়াগুলি তিনি নিজের হাতে নামিয়েছিলেন।

২

এই ঘটনার পূর্ব হতেই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বিনুর অন্ধ ভক্তির অবসান হয়েছিল। তবে সে কোনো দিন তাঁর প্রশংসা করতে পরাঙ্মুখ হয়নি। বিলেতে থাকতে তাঁর প্রসঙ্গে ইংরেজীতে লিখেছিল, তার আগে দেশে থাকতে বহুবার বিভিন্ন ভাষায়। যে লোকটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জিন্দাবাদ হাঁকে সে যদি কোনো একটি বই পড়ে নিরাশ হয় ও নিন্দাবাদ করে তবে সে আর যাই হোক শত্রু নয়।

শরৎচন্দ্র এখন নেই, সেসব বাদ প্রতিবাদের উপর যবনিকা পড়েছে। এখন মনে হয়, বিনু যদি অমন তস্করের মতো তাঁকে না দর্শন করত তবে হয়তো "শেষ প্রশ্ন" নিয়েঅতটা নিষ্করুণভাবে নাও তিরস্কার করত। অঘটনঘটনপটীয়সী নিয়তি তাকে এক ঘণ্টার জন্যে সহযাত্রী করে চিরকালের জন্যে এমন একটা false position-এ নিক্ষেপ করল যার প্রতিকার হতে পারত শরৎচন্দ্র অকালে অস্ত না গেলে।

সেসব কথা মন থেকে সরিয়ে বিনু ভাবে শরৎচন্দ্রের প্রতি কী করলে সুবিচার করা হয়। অন্ধ ভক্তি অবশ্য ফিরবে না, কিন্তু ভক্তির ব্যত্যয় হয়নি। এখনো বিনু তাঁর ভক্ত। তার মানে এ নয় যে সে নিন্দার বিষয় পেলে নিন্দা করবে না, নির্জলা সাধুবাদ করবে। কিন্তু নিন্দা প্রশংসা অবান্তর, লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায় বিচার।

এ দেশের কথাসাহিত্যে তাঁর মতো প্রতিভা জন্মগ্রহণ

করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র অন্য কারণে নমস্য, কিন্তু শরৎচন্দ্র সত্যি অপরাজেয় কথাশিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্র পড়তে পড়তে অবসাদ আসে, শরৎচন্দ্র পড়তে বসলে শেষ না করে নিষ্কৃতি নেই। দু'তিন শো বছর আগে জন্মালে শরৎচন্দ্র হয়তো কথক ঠাকুর হয়ে গ্রামে গ্রামে পসার জমাতেন। তেমন কথক কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। তখনো তিনি এমনি জনপ্রিয় হতেন, এমনি আদরণীয়।

কথকতাই ছিল তাঁর স্বাভাবিক বৃত্তি। যেখানে যা দেখেছেন যা শুনেছেন, যা অনুভব করেছেন তার বিবরণ দেওয়াই ছিল তাঁর স্বধর্ম। তিনি যে কোনো দিন কবিতা লেখেননি তার তাৎপর্য এই যে তাঁর ভিতরে কবিত্ব বলতে সামান্যই ছিল। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সত্যিকারের কবি। বঙ্কিম যদিও কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন তবু কবিত্ব তাঁকে ছাড়েনি। শরৎচন্দ্র অবশ্য স্থলে স্থলে কবিত্ব করেছেন, কিন্তু বিধাতা তাঁকে কথক ঠাকুর করেই গড়েছিলেন, তিনি কথকতার চূড়ান্ত করে গেলেন।

কথকতার সঙ্গে কথাবার্তার প্রভেদ আছে। যাঁরা বীরবলের রচনার স্বাদ পেয়েছেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে বীরবল হচ্ছেন বৈঠকী আলাপ-আলোচনায় ওস্তাদ, তিনি গল্প বলতে বসলে বাক্যের দ্বারা মাতিয়ে রাখেন। আর তাঁর বাক্যের রূপই তাঁর গল্পের রূপ। অমন রূপবান বাক্য শরৎচন্দ্র কী করে পাবেন! তাঁর সমস্ত মন পড়ে থাকে বিবরণে। অপর পক্ষে, অমন বিবরণী শক্তি বীরবলের বা রবীন্দ্রনাথের নেই। বীরবল বাক্‌পটু,

রবীন্দ্রনাথ অন্তর্যামী। তাঁদের গল্পের মূল্য বিবরণনিরপেক্ষ। কিন্তু শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাস বিবরণবিরহিত হলে আকর্ষণশূন্য।

শরৎচন্দ্রের কথকতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তাঁর অতুলনীয় দরদ। তিনি যে শুধু কথক ঠাকুর ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন দা'ঠাকুর। ইতর ভদ্র সব রকম মানুষের সঙ্গে মিশতে পারা খুব কম লোকের পক্ষেই সহজ। লেখকরা তো সচরাচর কুণো। তিনি এ বিষয়ে লেখকদের মধ্যে একক। লেখা ছিল তাঁর পেশা, মেশা ছিল তাঁর নেশা। মেশার মূলে ছিল দরদ। তাঁর গল্পে উপন্যাসে বুকের রক্ত মেশানো। বিবরণের শক্তি অন্য কোনো কোনো লেখকেরও আছে, কিন্তু সোনার সঙ্গে সোহাগার মতো বিবরণের সঙ্গে সমব্যথা বড় দুর্লভ গুণ। হিন্দী সাহিত্যের প্রেমচাঁদ ব্যতীত শরৎচন্দ্রের মতো ব্যথার ব্যথী ও ব্যথার বিবরণকার—একাধারে দুই—খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সাধারণত একটি মেলে, অন্যটি মেলে না।

শরৎচন্দ্রকে বিনু আরো দু'বার দেখেছে, দু'বারেই লক্ষ্য করেছে তাঁর মুখে অনির্বচনীয় বিষাদ। তাঁর বেদনাবোধ একান্ত প্রগাঢ় ছিল, শেষ জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর বেদনার উপর প্রলেপ মাখাতে পারেনি। তিনি যে একজন পাকা বিষয়ী লোক ছিলেন এটা ঠিক, কিন্তু মানুষকে তার বিষয়বৃত্তির বা পার্থিব সাফল্যের দ্বারা জড়িয়ে দেখাটা ভুল দেখা। সাফল্য তাঁর ক্ষতি যা করেছিল তা বাহ্য। সে ক্ষতি ভিতরে পৌঁছয়নি, তাই তাঁর সমবেদনায় কোনো ছলনা ছিল না। তিনি ছিলেন অকপট।

শুনতে পাই তাঁর বই আজকাল তেমন চলে না। এর একটা কারণ বোধ হয় প্রতিক্রিয়া। সব লেখকের কপালে তা জোটে। কিছু দিন পরে আবার প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হবে। তখন আবার সেসব বই তেমনি সচল হবে। আর একটা কারণ এ কালের মানুষ নিজের জীবনে এত দুঃখ পাচ্ছে যে পরের দুঃখের কাহিনী পড়ে জীবন দুর্বহ করতে নারাজ। আইডিয়ার দিকেই মানুষ ঝুঁকছে। সোশ্যালিজম প্রভৃতি আইডিয়াগুলি ক্রমে কথাসাহিত্যেও প্রবেশ করছে। শরৎচন্দ্রও শেষ বয়সে আইডিয়ার দাবী মেনেছিলেন। কিন্তু মানা যথেষ্ট নয়, জানা আবশ্যক। ভাসাভাসা জ্ঞান নিয়ে নতুন ধরণের উপন্যাস লিখলে তা কেউ মেনে নেবে কেন? শরৎচন্দ্রের বিবরণী শক্তি ও বেদনাবোধের সঙ্গে তৃতীয় কোনো গুণের সমাহার ঘটেনি, তাই ভাবজিজ্ঞাসু পাঠকপাঠিকার তৃপ্তি হয় না তাঁর শেষ বয়সের লেখা পড়ে। সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলতে তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আয়াস ছিল না। এইখানেই তাঁর ট্র্যাজেডী। না খাটলেও যদি টাকা আসে তবে খাটতে চায় কে!

এ দোষ বিন্নুর সমবয়সীদেরও আছে। শরৎচন্দ্রের দোষের অনুবর্তন করে কেউ তাঁর গুণের অধিকারী হবেন না। বরং তাঁর গুণের অনুবর্তন করলে পার্থিব না হোক অপার্থিব সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ এ কালের পাঠকের মন না পেলেও পরবর্তী কালের মনোনীত হওয়া সম্ভবপর।

শরৎচন্দ্রের মধ্যবয়সের লেখা থাকবে। কেউ না পড়লেও

সেসব গল্প সেসব উপন্যাস তাঁকে ও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে অমর করবে। তারা কি তাঁর সৃষ্ট চরিত্র? তারা তাঁর দৃষ্ট চরিত্র। তারা বিধাতার সৃষ্টি। সেইজন্যে এমন সজীব। তারা থাকবেই, আর তাদের মধ্যে থাকবে চিরকালের বাংলা দেশ। দেশকে এমন করে কেউ ভালোবাসেনি, এই হোক শরৎচন্দ্রের **epitaph.**

(১৯৩৮, ১৯৪২)

রবীন্দ্রনাথ ঃ বিনুর সাক্ষ্য

১

বিনু তখনো জানত না যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, কিংবা জানলেও বুঝত না, কেন। হঠাৎ একদিন তার চোখে পড়ল ইণ্ডিয়ান প্রেসের "চয়নিকা"।

ইতিপূর্বে তাঁর নাম শুনেছিল কি না স্মরণ নেই, সম্ভবতঃ শুনেছিল "মুকুট" নাটিকার অভিনয় উপলক্ষে, কিন্তু তার বন্ধুরা ভালো ভালো পার্টগুলি দখল করে তাকে ধুরন্ধর সাজতে দেওয়ায় তার আত্মাভিমানে এমন ঘা লেগেছিল যে সে কেবল ইন্দ্রকুমার আর ইশা খাঁর কথাই ভাবছিল, তাদের স্রষ্টার সমাচার নেয়নি।

বন্ধু ও বয়োজ্যেষ্ঠ মহলে তখন বঙ্কিম, গিরিশ ও দ্বিজু রায় বরেণ্য বলে কীর্তিত। বিনুর নিজেরও তখন কাব্যের চেয়ে নাটকে উপন্যাসে, শান্ত রসের চেয়ে বীর রসে, অধিক অনুরাগ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রতি মনোযোগের আবশ্যক ছিল না। যাঁরা "মুকুট" নির্বাচন করেছিলেন তাঁরা বিশ্বাস করতেন না যে তার প্রণেতা কবিকুলমুকুট। বোধ হয় বালকদের অভিনয়যোগ্য নাটিকা খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে ঐ মনোনয়ন।

সহসা "চয়নিকা" আবিষ্কার। বয়স তখন এগারো কিংবা বারো। বইখানি এক বার চোখে পড়েই অদৃশ্য হলো, মনে রইল

শুধু ছবিগুলি, ছবির নিচের কবিতার টুকরোগুলি, অদর্শনের অতৃপ্তি ও পুনর্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা। দু'তিন বছর পরে পুনরায় সে বই বিনুর হাতে আসে, কিছু দিন থাকে। তত দিনে সে মাসিকপত্রের কল্যাণে কবির সঙ্গে কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। তখন চলছে "বলাকা," "পলাতকা"র পর্যায়।

বন্ধুরা বলে, রবিবাবু কবি বটে, কিন্তু দ্বিজু রায়ের সঙ্গে তুলনা হয় না। কোন এক সাহেব নাকি তাঁকে ইংরেজীতে লিখতে সাহায্য করেছেন, সেসব ধরতে গেলে সেই সাহেবেরই লেখা। তাতে নাকি বিদেশে তাঁর সুনাম হয়েছে, কিন্তু ওটা সেই সাহেবেরই পাওনা।

মাস্টার মশাই বলেন, মানছি রবি ঠাকুর অসামান্য লেখক, কিন্তু তা শুধু গদ্যে। পদ্যে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি এখনো সকলের শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণ করেই রবিবাবুর কবিযশ।

অকালপক্ক বালক বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস পড়েছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে তখনো মজেনি। "রসে অনুমগন" হতে হলে "বিদগ্ধ জন" হওয়া চাই, কিন্তু বিনুর রাধারা তখনো বিদ্যাপতির রাধা হয়ে ওঠেনি, চণ্ডীদাসের রাধা হয়ে ওঠা তো আরো বয়ঃসাপেক্ষ। মহাজনদের মধ্যে নরোত্তম দাসকেই তার উপাদেয় লাগত, কীর্তনকালে তাঁর পদগুলি চোখে জল আনত—এবং কীর্তনান্তে প্রসাদ।

বিনু ছিল তার বন্ধুদের মতো দ্বিজু রায়ের ভক্ত। বলা যেতে

পারে দ্বিজু রায়ের পাঠশালায় লালিত। যেমন নরোত্তমের কীর্তন তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীত বিনুকে দিত অপর দশজনের সঙ্গে কণ্ঠসংযোগের সুযোগ। আর বীর রসের প্রতি তার একটা অহেতুক আকর্ষণ ছিল। সেই বয়সে সেও এক রাশ নাটক লিখেছিল, সে সব নাটকের প্রথম অঙ্কে "ধর অস্ত্র, কর যুদ্ধ," শেষ অঙ্কে "পতন ও মৃত্যু"।

বিনুর জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ যেমন আকস্মিক তেমনি বিলম্বিত। কিন্তু বিলম্বে এসেও তিনি সকলের সামনের আসনখানি অধিকার করে বসলেন। বন্ধুদের পরিহাস, মাস্টার মহাশয়ের উপহাস, আত্মীয়দের উপেক্ষা তাকে বিচলিত করল না, সে তার অবিকশিত বুদ্ধি ও অনিয়ন্ত্রিত রুচি দিয়ে আপন করে নিল তাঁকে—তিনি এশিয়ার পোয়েট লরিয়েট বলে নয়, তিনি বিনুর মতো অবোধ জনের সমবয়সী বলে।

"কেশে আমার পাক ধরেছে বটে.
তাহার পানে নজর এত কেন ?
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক বয়সী জেনো।"

বিনু যে তাঁর রচনার বিশেষ কিছু বুঝত তা নয়। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত, "কিছু বুঝলে ?" বিনু অমনি উত্তর দিত, "এসব তো বোঝবার জন্যে নয় বাজবার জন্যে।" কেউ যদি বলত, "বুঝেছি," বিনু ক্ষুব্ধ হতো। কারণ, বুঝলে কি উপভোগ করা যায় ? সব যে স্পষ্ট হয়ে গেল, একটুও রহস্য রইল না।

বিন্নুকে মুগ্ধ করত তাঁর আলো আঁধারি, তাঁর কিছু খোলা কিছু ঢাকা, তাঁর হাত খালি করে হাতে রাখা। অর্থের চেয়ে ইঙ্গিত বেশী, ব্যক্ততার চেয়ে ব্যঞ্জনা বেশী, ধরাছোঁয়ার চেয়ে লুকোচুরি বেশী, সেই জন্যেই বিন্নু তাঁর কবিতা বার বার পড়ত, বার বার ভোগ করত। যদি সব বুঝে ফেলত তবে আর পড়ত না, ভুলে যেত। কিন্তু সব কেন, একটুও বুঝত কিনা সন্দেহ। তা সত্ত্বেও সে খুশি হতো, মনে রাখত, গুন গুন করত। দুর্বোধ বলে অভিযোগ করত না, অভিযোগ শুনত না। বরং দুর্বোধ্য বলেই, রহস্যময় বলেই, রাহুর মতো গ্রাস করত, পরিপাক না করেই আত্মসাৎ করত।

এমনি করে অন্ধ ভক্তের উদ্‌ভব হয়। বিন্নুও ছিল কবির একজন অন্ধ ভক্ত। তার সেই অন্ধ ভক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল, যৌবনোদ্‌গমের পরেও। এখন অবশ্য ভক্তি আছে, কিন্তু অন্ধতা নেই। তাতে হয়েছে বিপদ। কেননা এই পাঁচিশ বছরে অন্ধ ভক্তি সংক্রামক হয়েছে। ছেলে বুড়ো সবাই এখন এক বয়সী—একই ভাবের ভাবুক।

সম্ভবতঃ আরো পঁচিশ বছর পরে উল্টো বিপদ হবে। তখন হয়তো বিন্নুর মতো জন কয়েক ভক্ত থাকবে, কিন্তু অন্ধ ভক্তেরা অন্ধ শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। অন্ধ শত্রু তবু ভালো, সম্পূর্ণ উদাসীন তার চেয়ে খারাপ। কবিদের পক্ষে জীবদ্দশায় সর্বত্র পূজিত হওয়া ঠিক সৌভাগ্য নয়। সকলেই যাকে গ্রহণ করে সকলেই তাকে ঠেলে। রাজনীতির এই নিয়ম সাহিত্যেও প্রযোজ্য।

সেই জন্যে কবিদের জীবিতকালে খ্যাতি যেমন বাঞ্ছিত অপখ্যাতিও সেই পরিমাণে প্রয়োজন। এক দল অভক্ত থাকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে মৃত্যুর পরে অন্ধদের রুচিবদলের ফলে খ্যাতিলোপ হবে না, অপখ্যাতিই খ্যাতিকে বাঁচিয়ে রাখবে, অভক্তেরাই ভক্তদের জাগিয়ে রাখবে।

২

বিন্দু যখন বড় হয়ে কবিকে দর্শন করতে গেল তখন নিজেকে প্রশ্ন করল, "তুমি তো তাঁকে দর্শন করবে, তিনি তোমাকে দর্শন করবেন কেন?"

অর্থাৎ তোমার মধ্যে এমন কী আছে যা তিনি দেখবেন? তুমি কি তোমার অন্তরের রূপটিকে আকৃতি দিতে পেরেছ তোমার বাইরের রূপে, কিংবা তোমার রচনার রূপে, কিংবা তোমার মনীষার রূপে? তুমি কি সুপুরুষ, অথবা সুলেখক, অথবা সদালাপী? কী হাতে করে তুমি তাঁর দরবারে দাঁড়াবে? অন্ধ ভক্তি?

বিন্দুকে সুপারিশ করবার কেউ ছিলেন না, ইনট্রোডিউস করবার মতো কিছু ছিল না। তখনো সে আত্ম আবিষ্কার করেনি, লিখেছে অতি সামান্য ও সেসব লেখা ক্বচিৎ ছাপা হলেও প্রতিশ্রুতিবিহীন। বিন্দু গিয়ে একাকী তাঁকে পাকড়াও করল, ছাত্র বলে পরিচয় দিল ও সুযোগ বুঝে পেশ করল একটি

জিজ্ঞাসা। কবি তার মুখ রেখেছিলেন, তার জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, বিনু সে বক্তৃতায় উপস্থিত ছিল না।

জিজ্ঞাসার কীট প্রবেশ করেছিল রমঁ্যা রলাঁর বই পড়তে পড়তে। টলস্টয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। আর্ট কি সকলের পাতে পৌঁছনোর উপযোগী হবে? না নিজের অন্তর্নিহিত নিয়ম মেনে স্বকীয় নিয়তি পূর্ণ করবে? অবশ্য এই জিজ্ঞাসার মীমাংসার উপর তৎক্ষণাৎ কিছু নির্ভর করছিল না। বিনু তার আপনাকে পায়নি, লেখক হতে মনঃস্থ করলেও তা ঠিক সাহিত্যিক অর্থে নয়। আত্মোপলব্ধির পর তার জিজ্ঞাসার নিরসন আপনি হলো। সকলের গ্রহণযোগ্য হওয়াটা গৌণ। মুখ্য হচ্ছে প্রেরণার বাঁশি শোনা। শিল্পী হচ্ছে ব্রজগোপী। সমাজের সঙ্গে ঘর করবে, কিন্তু কান পাতবে কানুর বেণু শুনতে। শিল্পী যদি তার প্রেরণার মর্যাদা রাখে, প্রেরণার যোগ্য হয়, তবে তার শিল্প স্বয়ং বিধাতার গ্রহণোপযোগী হবে, সুতরাং মহাকালের, সুতরাং চিরন্তন সমাজেরও। তার যে সৃষ্টি তা বিশ্বসৃষ্টিরই অঙ্গীভূত হবে, অতএব অবিনশ্বর, অতএব লোকহিতকর।

বিনু যখন আত্মনির্ভর হওয়ার পর কবির কাছে যায় তখন সে প্রেমের কবিতা লিখছে। সে সব তাঁকে দেখাবার মতো নয়। আর জিজ্ঞাসাও ততদিনে মীমাংসা পেয়েছে, তাঁকে বিরক্ত করবার বিশেষ কোনো কারণও নেই। বিনু দূরে দূরেই থাকল এবং দূর থেকেই ফিরল।

এর পরে আবার যখন গেল তখন কৃতী রূপেই গেল, তিনি তার লেখা পড়েছিলেন। সে ধন্য হলো।

কিন্তু তার লেখা কি তার লেখা! বিনুর প্রশংসা করে একজন বিশিষ্ট কবি লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করে যাঁরা সার্থক হয়েছেন আপনি তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

প্রশংসাটা বিনুর কাছে নিন্দার চেয়েও নিদারুণ লাগল। সে কি তা হলে বিনু নয়, সে কি স্বয়ংসিদ্ধ নয়? সে তবে রবীন্দ্রনাথের অনুসারক? স্বনামা নয়, রবিনামা?

অনুসরণ ও অনুকরণ অবশ্য অভিন্ন নয়। কিন্তু অনেক সময় দ্বিতীয়টা কটু হবে বিবেচনা করে প্রথমটা প্রয়োগ করা হয়। বিনু কি তবে অনুকারক? তাই যদি হয় তবে শ্রেষ্ঠ হওয়াটা সুখের কথা নয়। সেরা জালিয়াৎ যে সব চেয়ে সাজা পায়।

কবির অনুমোদন লাভ করে কোথায় বিনু আনন্দ করবে, না চোরের মতো মুখ ঢেকে রইল। তখন থেকে তাকে পীড়া দিতে থাকল রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। না, সে তাঁর প্রভাব স্বীকার করবে না। সে তাঁর প্রভাবের বাইরে ছিটকে পড়বে। সে তাঁর সৌর মণ্ডলের বৃহস্পতি হবে না। সে উল্কার মতো ছুটে বেরিয়ে যাবে।

এই অদ্ভুত চিত্তপীড়া বিনুকে এমন একান্তভাবে অপ্রকৃতিস্থ করল যে সে রবীন্দ্রনাথের রচনায় চোখ বুলিয়ে যাওয়ার সময় পেল না। সাহস পেল না। পাছে তাঁর প্রভাব পড়ে।

বলা বাহুল্য, কবির সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বরাবর সহৃদয়

ছিল, সেখানে কোনো তিক্ততার সংস্পর্শ ঘটেনি। কিন্তু শিল্পকার্যে সেই যে গুরুশিষ্য সম্পর্ক সেই সম্পর্ক বিন্নু ছেদন করতে সচেষ্ট হলো।

ফল হলো এই যে সে কবির প্রভাব এড়াতে গিয়ে কাব্যের প্রভাব এড়ালো। কাব্য পড়তে স্পৃহা রইল না, সাহিত্যেও অরুচি ধরল। সে অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞান পড়ে। ইতিহাস তো তার পুরাতন বন্ধু। তার কথাবার্তা শুনে আলাপীরা মন্তব্য করেন, "কই, সাহিত্যিকের মুখে সাহিত্যের কথা নেই কেন?" বিন্নু বলে, "সাহিত্যচর্চা এখন শিকেয় তোলা। আমি ভূতপূর্ব সাহিত্যিক।"

একটি লাইনও লিখতে তার হাত ওঠে না। যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। কী লিখবে? কেন লিখবে? লিখতে বসলেই মনে পড়ে নানা অসংবদ্ধ পংক্তি তাঁর কবিতার, তাঁর গদ্যের। তাঁরই ভাব, তাঁরই ভাষা। তাঁকে অস্বীকার করে তাঁকে অতিক্রম করা অসম্ভব। হয় তাঁকে স্বীকার করে নিয়ে স্বীয় সাধনার দ্বারা অতিক্রম করতে হবে, নয় তাঁকে অস্বীকার করে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে অপসরণ করতে হবে। গোটা সাহিত্যক্ষেত্র থেকে না হোক, কাব্যক্ষেত্র থেকে বিন্নু অপসরণ করল। পড়ল গিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মরুভূমিতে। বহুকাল সেই বালুশয্যায় শয়ন করে সে স্বপ্ন দেখল নতুন জীবনের। সামাজিক আবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ জড়িত, এই বিশ্বাস তাকে জাগ্রত রাখল শুধু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-বৈজ্ঞানিক চেতনায়।

ভাষা সম্বন্ধেও সে কিছু দিন থেকে ভাবছিল। বাংলা কবিতার ভাষা যেখানে পৌঁছেছে সেখানে একটা ঘূর্ণী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই ঘূর্ণীতে ঘুরছেন, সেখান থেকে তাঁর মতো সর্বশক্তিমানেরও নিষ্কৃতি নেই। তা দেখে সুধীন্দ্রনাথ উড়ে গেছেন আকাশে। সংস্কৃত অভিধানের আকাশ। বুদ্ধদেব দেশী নৌকায় বিলিতী এঞ্জিন জুড়ে আধুনিকতার স্টীম ভরছেন, বিষ্ণু দে মধ্যস্থতা করছেন। কিন্তু গতি যেটুকু যেখা যাচ্ছে অগ্রগতি নয়, চক্রগতি। সুতরাং বিন্নু যদি নিষ্ক্রিয় বসে থাকে তা হলে কেউ যে তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন তা নয়। বিন্নুর বদ্ধমূল ধারণা যে বাংলা কবিতাকে গতি দিতে পারে—চক্রগতি নয়, অগ্রগতি—লোকসাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা! লোকসাহিত্য অবশ্য হাল-ফ্যাশনের গণসাহিত্য নয়, সেকালের Folk সাহিত্য। ছড়া তার সামিল।

৩

অবশেষে বিন্নুর কাণ্ডজ্ঞান ফিরল। পূর্বপুরুষের রক্তের প্রভাব যেমন তার রক্তের মধ্যে রয়েছে, পূর্ব কবিদের ভাবের প্রভাব তেমনি তার ভাবনায়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অস্বীকার করতে যাওয়া মূঢ়তা। বরং কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে নেওয়াই সিদ্ধির শর্ত। হাঁ, পড়েছে তাঁর প্রভাব আমার রচনায়। হাঁ, আমি অনুসরণই করেছি তাঁকে। অনুকরণও করেছি। তা সত্ত্বেও আমি বিন্নু, আমি নিজের কক্ষায় ধাবমান জ্যোতিষ্ক।

আমি তাঁকে স্বীকার করলেই তাঁকে অতিক্রম করবার ছাড়পত্র পাব। পূর্বগামীদের কাছে ঋণী হতে যার সাহস নেই সে তার সামান্য মূলধনে কতটুকু লাভ করবে! বড় বড় ব্যবসায়ীরা বড় বড় খাতক। কর্জ করতে তাঁদের লজ্জা নেই।

এর পরে সে যখন কবি সন্দর্শনে গেল তখন মাথা হেঁট করে পায়ের ধূলো নিল—যা সে আগে কখনো করেনি, ছাত্র অবস্থায়ও না। "গুরুদেব" বলে উল্লেখ করল—যা সে আগে কোনো দিন করেনি, প্রশংসার প্রত্যুত্তরেও না। তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবের নিকট নতজানু হয়েই সে পীড়ামুক্ত হলো। ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে তবেই সাহিত্যিকের শান্তি। যারা প্রবর্তক হবে তারা অনুবর্তক হবে তার পূর্বে। সাহিত্য একটা প্রবাহ। প্রভাব এড়াতে গেলে প্রবাহ থেকে সরে গিয়ে চরে বন্দী হতে হয়। সেই সকরুণ বিচ্ছেদ মৌলিকতার দ্বারা ভরে না, তার ক্ষতিপূরণ নেই। যারা ঐতিহ্যভ্রষ্ট তারা পিতৃধনবঞ্চিত অনাথ নাবালক। তেমন স্বনামা হয়ে পৌরুষ থাকতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণতার অভাব। বরং প্রভাবের ভয় কাটালেই প্রভাব ক্রমে ক্রমে কেটে যায়।

ওদিকে বিনুর দৃষ্টির সম্মুখ থেকে বস্তুবাদের মরীচিকা অপসৃত হয়েছিল। যা কিছু দৃশ্যমান বা দৃষ্টিগোচর তাই একমাত্র সত্য বা অখণ্ড সত্য, এ ধারণা বিলীন হলে পরে রিয়ালিটির প্রকৃত রূপ বিভাসিত হলো। এত দিন সে রবীন্দ্রনাথকে রিয়ালিস্ট বলে আমল দেয়নি, এখন আসন দিল। ধ্যানীরাই রিয়ালিস্ট হয়ে

থাকেন তিনি ধ্যানী। প্রাণের মতো পদার্থবিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার অতীত পদার্থ ধ্যানেই ধরা দিতে পারে, যন্ত্রে কিংবা গণিতে কিংবা ইন্দ্রিয়ে নয়।

প্রাণের বর্ণে গন্ধে স্বাদে ও লাবণ্যে যে রচনা ভরপূর সে যদি অবাস্তব হয় তবে দ্যুলোকভূলোকব্যাপী প্রাণ নিজেই অবাস্তব। বাস্তবের একটা কৃত্রিম সংজ্ঞা নির্মাণ করে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে সেই সংজ্ঞার মধ্যে পূরতে না পারার বিড়ম্বনা বিন্দু লক্ষ্য করেছে। তেমন অভিরুচি বিন্দুরও যে হয়নি তা নয়। বিজ্ঞানের মতো সাহিত্য যাতে **objective** হয় সে বিষয়ে সেও জল্পনাকল্পনা করেছে। পরিণামে সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। হতে পারত অনাসৃষ্টি, কিন্তু বিন্দুর রসবোধ তাকে তেমন পরিণাম থেকে রক্ষা করেছে।

বিন্দু কদাপি কবুল করেনি যে সামাজিক আবর্তন হচ্ছে **end**, সাহিত্য হচ্ছে **means**। বরং তার জীবনের বস্তুবাদী অধ্যায়েও সে ধরে নিয়েছে যে সামাজিক ওলটপালট হচ্ছে **means**, সমৃদ্ধতর শিল্প সাহিত্য প্রেম হচ্ছে **end**, অর্থাৎ বর্তমান ব্যবস্থার ধ্বংসের উপর যে নতুন ব্যবস্থার পত্তন হবে তাতে কবিরা হবে নিরঙ্কুশ, প্রেমিকরা নির্বন্ধন, বাউলরা নির্দৈন্য। সবাইকে খেটে খেতে হবে, এই নির্দয় নীতি যদি রাষ্ট্রের মূলনীতি হয় তবে নতুন ব্যবস্থা হবে এই তিন শ্রেণীর অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথকে যদি খোরাকের জন্যে খাটতে হতো তিনি আর যাই হোন রবীন্দ্রনাথ হতেন না।

আর্টই যে **end** বিন্দুর এই মজ্জাগত প্রত্যয় তাকে শিল্পীর

অপমৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরিয়ে এনেছে। যেমন করে ফিরে এসেছিল বাইবেলের সেই অমিতব্যয়ী তনয়।

তা বলে তার অন্ধ ভক্তি নেই। সাত আট বছরের ব্যবধানে সে ক্রিটিকাল হতে শিখেছে। কবিকে মেনে নিলেও কবিতাকে মেনে নেয় না। উপরে যে ঘূর্ণীর উল্লেখ করা হয়েছে কবিতা তাঁতে ঘুরপাক খেয়েছে কবির শেষ-বয়সে। বিশেষ কোথাও উপনীত হয়নি। আধুনিক বাংলা কবিতার আসল সমস্যার সমাধানে আমরা তাঁর কাছে যথেষ্ট সহায়তা পাচ্ছিনে। ভাব ও ভাষার অসামঞ্জস্য দিন দিন বাড়ছে।

৪

বিন্নুর জীবনে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে চণ্ডীদাসের পদপাত ঘটেছিল। সেই থেকে চণ্ডীদাসের প্রতি তার একপ্রকার পক্ষপাত। বঙ্গের জ্যেষ্ঠ কবিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকার করতে সে সম্মত হয়নি, রবীন্দ্রনাথই তার বিচারে শ্রেষ্ঠ। তথাপি চণ্ডীদাসের সঙ্গেই তার **affinity**, চণ্ডীদাসের মতোই সে প্রথমে প্রেমিক, তারপরে কবি, বোধ হয় পরিশেষে বাউল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রথমে কবি, তারপরে কবি, পরিশেষেও কবি। সেইজন্যে কবিহিসাবে শ্রেষ্ঠ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। রবীন্দ্রনাথের সাধনা কবিভাবের। চণ্ডীদাসের সাধনা প্রেমী-ভাবের।

এ তো গেল পক্ষপাতের একটা কারণ। আর একটা কারণ

আর একটু জটিলঃ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন বিনুর জীবনের উপর এমন ছাপ রেখে গেছে যে সে ছাপ ইউরোপের মানসসরোবরস্নানে ধুয়েমুছে যায়নি, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মানসিক প্রক্ষালনেও সে দাগ ওঠেনি। অসহযোগ আন্দোলনের যে অংশটা তাকে চঞ্চল করেছিল সেটা ইংরেজ কিংবা ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধতাবাচক নয়। বিনু বুঝতে পেরেছিল যে ইংরেজীতে যাকে বলে people তারই মধ্যে রয়েছে বীর্য, সৌন্দর্য, তাজা ভাষা ও তাজা ভাব। ইংরেজের সঙ্গে মান অভিমানের খেলা বিনুকে চিরকাল হাসিয়েছে, কিন্তু people-এর কাছে বল সন্ধান করা সত্যিই sublime.

পরবর্তীকালে peopleকে অপমান করা হয়েছে masses আখ্যা দিয়ে। মানুষকে অপমান করা হয়েছে গণেশ বলে অভিহিত করে। যাক, সে কথা অবান্তর। কথা হচ্ছিল, people-এর অন্তরে যে বীর্য ও সৌন্দর্য আছে এটা সেই ১৯২০-২১ সাল থেকে বিনুর মনে বিঁধে রয়েছে। প্রেমের কণ্টক যেমন দিনের পর দিন দৃঢ়প্রবিষ্ট হয় এই কণ্টকও তেমনি। রমঁ্যা রলাঁর "People's Theatre" ও টলস্টয়সংক্রান্ত পুঁথিপত্র পড়ে বিনুর ধারণা কায়েমী হয়। তা বলে সে রলাঁ কিম্বা টলস্টয়ের সঙ্গে একমত হয়নি সাহিত্যকে জনমনের উপযোগী করা নিয়ে। সেখানে সে রবীন্দ্রশিষ্য। কবি হবে জনগণমন অধিনায়ক। নেতা নিজেকে নীয়মানদের উপযোগী করেন না, করতে গেলে হন অভিনেতা। নীয়মানদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে

নেতা করবেন তাঁর inner voice-এর প্রতি কর্ণপাত। কবির কাছে তাঁর inner voice হচ্ছে ধ্রুবতারা। কম্পাস যেমন সর্বদা উত্তরমুখী তেমনি কবির লেখনীও প্রতিনিয়ত প্রেরণামুখী।

বীর্য ও সৌন্দর্য, তাজা ভাব ও তাজা ভাষা সংগ্রহ করতে হবে people-এর কাছে। বিন্নুর এই ধারণার উন্মেষ অসহযোগ আন্দোলনের সময়। টলস্টয়ের মতো গ্রামে গিয়ে চাষীদের সঙ্গে চাষী বনবার মতলব ছিল তার, উপরন্তু চাষানী বিয়ে করবার। বিন্নুটা কোনো কাজের নয়, কাজের বেলা পিছু হটাই তার স্বভাব। তার প্রিয়তম বন্ধু এবিষয়ে বিন্নুর চেয়ে সাহসী। তিনি চাষীদের সঙ্গে চাষী হয়েছেন, চাষানী বিয়ে না করলেও স্ত্রীকে চাষানী করেছেন। তিনি যদি কবি হতেন তবে বিন্নুকে অনায়াসে হারিয়ে দিতেন, এক দিনেই ছাড়িয়ে যেতেন। তাঁর স্বরাজ সাধনা সাঙ্গ হলে হয়তো সাহিত্যে নামবেন। তখন কি বিন্নু তাঁর সঙ্গে পারবে?

এদিক থেকে চিন্তা করলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার এক জায়গায় একটা দুর্বলতা ছিল। তিনি সেকথা জানতেন। সেই জন্যে স্বদেশী যুগে ভার নিয়েছিলেন সর্বতোমুখ কর্মের। তাঁর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন কার্যত যে আকারই ধারণ করে থাকুক, জনসমূহের প্রতি প্রাণের টান থেকেই তাদের সূচনা। তাঁর "গল্পগুচ্ছ" এর আরেক প্রমাণ। তিনি চেষ্টা করেছিলেন প্রজাদের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যেতে। পারেননি বলে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না। টলস্টয়ও সত্যিকার "মুজিক" হতে

পারেননি। চণ্ডীদাসের কালে যা একান্ত সহজ ছিল এ কালে তা কল্পনাতীত কঠিন। বিনু তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে।

তা হলেও বিনুকে ও তার পরবর্তীদেরকে এই চেষ্টাই করতে হবে। এ ছাড়া পথ নেই। বিশুদ্ধ কাব্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। যাঁরা অধ্যবসায় করেছেন তাঁরা ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করবেন এর তাৎপর্য।

৫

এমন কথা বিনু বলছে না যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই বাংলা কবিতার সহমরণ ঘটেছে বা সব সম্ভাব্যতা নিঃশেষ হয়েছে। তার বক্তব্য শুধু এই যে বিশুদ্ধ কাব্যসাধনায় জীবনব্যাপী অভিনিবেশ যদি রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধির সঙ্কেত হয়ে থাকে তবে তাদৃশী সিদ্ধি আমাদের কারো কপালে জুটলেও আমরা দেখব যে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা হয়নি, হলে সামান্যই হয়েছে। প্রাণপণ পরিশ্রমেও যেটুকু ফল লাভ হবে সেটুকু অকিঞ্চিৎকর। আমাদের কর্তব্য বিশুদ্ধ কাব্যসাধনায় অন্তত কিয়ৎকাল ক্ষান্তি দিয়ে উপরে যে পন্থার আভাস দেওয়া হয়েছে সেই পন্থার পদক্ষেপ। অথবা অন্য কোনো পন্থা আবিষ্কার।

ইংরেজী সাহিত্যের অনুরূপ সন্ধিক্ষণে এক দল লেখক ও চিত্রকর নিজেদের নাম রেখেছিলেন **Pre-Raphaelites**। এই নামকরণটা বিনুর ভারী ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথকে যদি

র‍্যাফেলের সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে বিষ্ণু যে পন্থার উল্লেখ করেছে সেই পন্থার পান্থদের বলতে পারা যায় **Pre-Tago-rites**। রবীন্দ্রপ্রভাবকে অস্বীকার করা অনাবশ্যক, কিন্তু চণ্ডীদাসের কালে ফিরে গিয়ে ধীরে ধীরে একালে ফিরে আসা অত্যাবশ্যক। নন্দলাল বসু যেমন অজন্তার যুগে ফিরে গিয়ে বর্তমান যুগে ফিরে আসছেন। যামিনী রায়ের উদাহরণ বোধ হয় আরো যুৎসই হবে। তিনি বাংলার **Folk Art**-এ ফিরে গেছেন ও মাঝে মাঝে আধুনিক ইউরোপীয় আর্টে যাতায়াত করলেও তাঁর আধুনিকতা বাংলার **Folk Art**এরই আধুনিকতা।

রবীন্দ্রনাথের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত যদি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে না থাকে তবে আমরা সহজেই দেখতে পাব কবিরা অন্যান্য শিল্পীদের মতো কারিকর বা **craftsmen**। যারা চরকা কাটে, তাঁত বোনে, কাঠের কাজ করে, মাটির ঘর বানায়, প্রতিমা গড়ে ও বাসন তৈরি করে কবিরা তাদেরই দলের লোক। ঘটনাচক্রে দলচ্যুত হয়ে ভদ্রসমাজে ভিড়েছে। এ সমাজে শ্রম আছে, সৃষ্টি নেই। সৌজন্য আছে, দরদ নেই। বিনয় আছে, আন্তরিকতা নেই। সামাজিকতা আছে, স্বাভাবিকতা নেই। হৈ চৈ আছে, প্রাণ নেই। রসাভাস আছে, রস নেই। এ সমাজে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সুখী হতে পারেননি, কখনো বজরায় কখনো আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছেন, অন্যথা আপনার মধ্যে আত্ম-গোপন করেছেন। ভদ্র ও ভদ্রাদের সঙ্গে বাস করে ভদ্র হয়ে ওঠা কবির পক্ষে মর্মান্তিক। নীট্‌শে বলতেন, "**A married**

philosopher is ridiculous"। বিন্নু বলে, "A respectable poet is absurd"। কবিমাত্রেই ভদ্র সমাজের বাহির, যদি সত্যিকার কবি হয়। রবীন্দ্রনাথও পারতপক্ষে ভদ্রসমাজের বাহিরে ছিলেন, কিন্তু তাঁর ট্র্যাজেডী হচ্ছে এই যে তিনি কারিকরদের সমাজে কল্কে পাননি। অর্থাৎ কুমোর কামার তাঁতী ছুতোর স্যাকরা শাঁখারী রাজমিস্ত্রীরা তাঁকে সমান ভেবে আপন করে নেয়নি, চণ্ডীদাস বা কাশীদাসকে যেমন করে নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা যদি মনে করি যে বছরে চারখানা বই লেখাই পুরুষার্থ এবং ইউরোপ আমেরিকায় সম্বর্ধনাই মোক্ষ তা হলে আমরা কিছুই শিখিনি বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডী যাকে বলেছি আমাদেরও সেটা ট্র্যাজেডী, কেননা যেসমাজে আমাদের কাব্যকলার প্রচার সে সমাজ আমাদের সমাজ নয়, যদিও ঘটনাচক্রে আমরা তার অন্তর্ভুক্ত। আর যে সমাজে আমাদের প্রকৃত স্থান সে সমাজে আমাদের হুঁকো বন্ধ। আমরা কারিকর, কিন্তু অন্যান্য কারিকরদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ। সেইজন্যে যারা অন্যান্য কারিকরদের ঘিরে দাঁড়ায় তারা আমাদের ছায়া মাড়ায় না। কাশীদাসী মহাভারত ঘরে ঘরে, আলাওলের পুঁথি অন্তত একটি জেলার গ্রামে গ্রামে, চণ্ডীদাসের পদ মুখে মুখে, রামপ্রসাদী গান যেখানে সেখানে। দেশ শিক্ষিত হলে রবীন্দ্রনাথেরও দিন আসবে, কিন্তু ভয় হয় শিক্ষার সম্যক বিস্তার সম্প্রতি হবে না, হলেও তা ভদ্রশিক্ষা হবে। ভদ্রশিক্ষা শিল্পের শত্রু। রসবোধের বৈরী। দেশশুদ্ধ লোক যদি ভদ্রলোক

হয় তবে ছবির চোখ, গানের কান, গঠনের হাত, নৃত্যের চরণ দেশছাড়া হবে।

৬

রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয় সম্বন্ধে বিনুব একটি থিওরী আছে। যে সময় তাঁর ইংরেজী "গীতাঞ্জলী" লণ্ডনে প্রকাশিত হয় সে সময় ইংরেজী ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় সাহিত্য এমন একজন কবির প্রতীক্ষা করছিল যিনি সর্বতোভাবে সহজ, অথচ আর্টের সারে-গামায় সিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী "গীতাঞ্জলি" এত সহজ যে বারো বছরের বালকও তার ভাষা বুঝতে পারে। টলস্টয় এই চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে এত দুরূহ যে বাহান্ন বছরের প্রৌঢ়ও সে ভাষা লিখতে পারেন না। ছন্দের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব জন্মালে, ধ্বনির উপর অধিকার মৌরসী হলে, একে একে সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করলে, বাহুল্যের লেশ না রাখলে সে ভাষা পোষ মানে, বোল শোনে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ঘোড়সওয়ারী করে ভাষা জিনিসটার প্রাণরহস্য আয়ত্ত করেছিলেন। সেইজন্যে ইংরেজী ভাষাও তাঁর শাসন মেনে সহজ চালে চলল।

সাহিত্যকে সহজ করার জন্যে টলস্টয়ের ব্যাকুলতা কেবল তাঁর একার ছিল না, ছিল ইউরোপের তৎকালীন আবহাওয়ায়। কেবল সহজ কথায় লিখলে কি সাহিত্য সহজ হয়? তা যদি হতো তবে শিশুপাঠ্য উপন্যাসগুলোর চেয়ে সহজ আর কী আছে! কথার সঙ্গে ছন্দ, ছন্দের সঙ্গে ধ্বনি, ধ্বনির সঙ্গে অর্থ, অর্থের

সঙ্গে ব্যঞ্জনা একাধারে সব মিলে জীবনের সৌন্দর্যে সহজ হলে তবেই সাহিত্য সহজ হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকে সুন্দর ও সহজ করে তোলার পরে ইংলণ্ডে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, দশ বছর আগে গেলে ও ইংরেজীতে "চিত্রা" কি "চিত্রাঙ্গদা"র তর্জমা করলে তেমন সাফল্য লাভ করতেন না। তাঁর জীবনের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স শোকে তাপে ভয়ানক. স্নেহ শোকতাপ তাঁর জীবনকে ও জীবনের সঙ্গী সাহিত্যকে নিরলঙ্কার ও নিরহঙ্কার করেছিল। প্রিয়বিরহের বেদনায় তিনি প্রিয়তমকে চিনেছিলেন, মৃতের মধ্যে অবলোকন করেছিলেন অমৃতময়কে। রিয়ালিটি যে অতি নিষ্ঠুর অথচ অতি মধুর, পরম ব্যথা অথচ পরম আনন্দ, সর্বব্যাপী শূন্যতা অথচ অন্তঃস্থলে পূর্ণতা, এই সহজ কঠোর উপলব্ধি তাঁকে ও তাঁর বাণীকে এমন এক স্তরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল যে স্তরে সাধারণ কবিদের ও সাধারণ কবিতার উত্তরণ নেই। তিনি স্বর্গ স্পর্শ করে মর্ত্যে নেমে এসেছিলেন ওই দশটি বছরে। সেইজন্যে স্বর্গের মতো সহজ হয়েছিল, সুন্দর হয়েছিল, তাঁর তখনকার কবিতা।

ইংরেজী "গীতাঞ্জলি"তে স্বর্গের আমেজ ছিল। ইউরোপ তখন এক ঝুটা রিয়ালিটিও আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। রিয়ালিটি যে প্রত্যেকের অন্তরে, সেই সহজ বোধটুকু হারিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাকে দিলেন সেই সহজ বোধ। তাঁর নিজের জীবনের কাঁটাবনের গোলাপ। ইউরোপ বহুকাল একজন মিস্টিক দেখেনি। ঠাওরাল তিনি একজন মিস্টিক। তুলনা করল মধ্যযুগের

মিস্টিকদের সঙ্গে। কিন্তু মিস্টিকরা তো শিল্পের স্বরগ্রামে সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ যে শিল্পী। বাক্‌সাধনার দ্বারা বাণীকে বশ করেছেন। তাঁর মিস্টিক খ্যাতি যদিও অযথা নয়, তবু বিভ্রান্তকারী। ইউরোপ কতকটা বিভ্রান্ত হলো। সেই বিভ্রমের প্রতিক্রিয়া ওখানকার সাহিত্যিক মহলে এখনো চলেছে। ওঁরা [illegible]যুগের কোটায় ফেলেছেন, আধুনিক যুগের এলাকায় না। অথচ তিনি পরম আধুনিক তথা চিরন্তন।

রবীন্দ্রনাথের সত্যিকার দিগ্বিজয় এইবার আরম্ভ হবে। তিনি পূর্ণ শিল্পী জীবনশিল্পী। তাঁর কাব্যসাধনাকে স্বরূপে দেখলে নিছক আর্টের দিক থেকে তাঁর কবিতার চূড়ান্ত সমাদর হবে। যেমন রাফেলের।

(১৯৪১)